# বিশাখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা মার্চ ১৯৬১

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সুপ্রীম পাবলিশার্স
১০ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ গণেশ বসু

মুদ্রাকর ঃ
গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিণ্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

নিরঞ্জন হালদারকে

# বিশাখা

দেবনাথ বললো, তুমি তা হলে এখন কোন্ দিকে যাবে? সাউথের দিকে ফিরবে নাকি?

আমি বললাম, না ভাই! আমি একটু কলেজ স্ট্রীট ঘুরে যাবো ভাবছি। দেবনাথ হাতার বোতাম খুলে ফেলে সার্ট সরিয়ে সাবধানে ঘড়ি দেখলো। তারপর বললো, সাড়ে সাতটা তো বাজলো! এখন আর কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে কি করবে?

আমি মনে মনে ভাবলুম, দেবনাথ কি প্রত্যেকবারই ঘড়ি দেখবার জন্য সার্টের হাতার বোতাম খোলে! তা হলে বোতাম আটকানোর কি দরকার? অথবা ঘড়ি না পরলেই হয়!

বললাম, এই একটু এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাবো!

—কে বন্ধু?

—আছে একজন, তুমি চিনবে না!

—আমিও তো তোমার বন্ধু। আজ না হয় আমার বাড়িতেই যেতে—একটু চা খেয়ে তারপর ফিরতে!

—আজ নয় ভাই, আর একদিন যাবো!

—তুমি আর গেছো! যেদিনই দেখা হয়, তোমার শুধু ঐ এক কথা। গেলে না তো একদিনও। বিশাখা প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

আমি কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হবার সুযোগ নেবার জন্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে লাগলুম। একটা ডবল্‌ডেকার একেবারে ফুটপাত ঘেঁষে আসছে। আমরা দুজনেই সরে দাঁড়ালুম। প্যাকেটটা দেবনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম সে খাবে কিনা। যেন কোনই ইচ্ছে নেই, নেহাৎ উপরোধে ঢেঁকি গিলছে এই ভাবে দেবনাথ বললে, দাও একটা!

আমি নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে আরাম করে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিশাখা কেমন আছে ?

—ভালোই আছে। তবে বড্ড একা একা থাকে। তোমরা মাঝে মাঝে গেলে-টেলে—

—আচ্ছা ভাই চলি আজ, আবার পরে দেখা হবে।

—তুমি তা হলে কলেজ স্ট্রীটেই যাবে ? আমার সঙ্গে যেতে চাও না ?

—না, না, তোমার সঙ্গে গেলে তো ভালোই হতো! কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে একটা বিশেষ কাজ আছে।

—তা হলে এসো কিন্তু একদিন বাড়িতে। কবে আসবে? কাল ? পরশু ? আমি তা হলে বিশাখাকে বলবো—

—না, কাল পরশু হবে না—এই মাসটা একটু ব্যস্ত আছি। চলে যাবো যে-কোনো একদিন।

রাস্তা পার হয়ে ওপাশে গিয়ে আমি ষড়যন্ত্রকারীর মতন আড়-চোখে দেবনাথকে দেখতে লাগলুম। আমার এখন দক্ষিণ কলকাতাতেই ফেরা দরকার যদিও, কিন্তু দেবনাথের সঙ্গে এক সঙ্গে যেতে চাই না। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে কথা বলেছি দেবনাথের সঙ্গে, বাকি পথটাও ওর বক্‌বক শোনার ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া দেবনাথ কতকগুলো অদ্ভুত ব্যবহার করে। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি বলে পকেটে হাত ভরে কন্ডাকটরের সামনে টিকিট কাটার জন্য পেড়াপিড়ি করে। আমি যদি ভদ্রতা করে একবার মাত্র বলি, না, না, আমিই দিই না—ব্যস্‌, দেবনাথ আর পকেট থেকে হাত বার করবে না। আমার টিকিট কাটা থেকে খুচরো পয়সা ফেরৎ নেওয়া পর্যন্ত সরু চোখে তাকিয়ে থাকবে, তারপর উল্টো চাপ দেবে আমাকেই। অনুযোগের সুরে বলবে, কেন, আমি টিকিট কাটলে বুঝি তোমার মানে লাগতো? আমি কি একদিনও টিকিট কাটতে পারি না! না হয় আমি এখন…

সামান্য দু'চার আনা পয়সার জন্য এসব কথা শুনতে কার ভালো লাগে ? এর আগে দু'দিন আমার এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। অথচ বছর দুয়েক আগেও দেবনাথ নিজের গাড়িতে ঘুরে বেড়াতো। যখন তখন গাড়ি থামিয়ে লিফ্‌ট দিতে চাইতো আমাদের।

আমি লক্ষ্য রাখতে লাগলুম, দেবনাথ বাসে উঠে পড়েছে কিনা ! ও চলে গেলে আবার আমাকে রাস্তা পেরিয়ে ওদিককার বাস ধরতে হবে। কে জানে, দেবনাথও হয়তো নজর রেখেছে, আমি সত্যিই কলেজ স্ট্রীটের বাসে উঠি কিনা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে দেবনাথ, সিগারেটটা পুরো শেষ করার আগে যে সে বাসে উঠবে না, এতো জানা কথাই !

সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষের সংসর্গ আমার ভালো লাগে না। দেবনাথকে দেখলেই মনে হয়, ওর ভেতরটা একেবারে মরে গেছে, বেঁচে আছে শুধু ওর পঞ্চভূতের শরীরটা। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওর শুধু অনুযোগ আর অভিমান। বেঁচে থেকে আর কি হবে, এই ধরনের একটা ভাব নিয়ে দেবনাথ বেঁচে আছে। এর থেকে তো মরে গেলেও পারে ? আমি যদি দেবনাথকে খুন করি, তাহলে হত্যাকারী হিসেবে আমার শাস্তি হবে, কিন্তু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি অপরাধ ?

দেবনাথের মুখোমুখি পড়ে গেলেই আমার অস্বস্তি হয়। অথচ অভদ্রভাবে এড়িয়ে যেতেও পারি না। এক সময় সুন্দর চেহারা ছিল দেবনাথের, ফর্সা, লম্বা ঋজু শরীর, তীক্ষ্ন নাক—এখনও সব ঠিক-ঠাক আছে, কিন্তু মুখে এক ধরনের শিরশিরে হতাশা। এইসব মুখ অন্য মানুষের মধ্যে দারুণ প্রভাব ফেলে। দেবনাথের মতন লোকদেরও সমাজের বাইরে বার করে দেওয়া উচিত। বিশাখার জন্য আমার দুঃখ হয়। কিন্তু আমি ওকে কি সাহায্য করতে পারি ? বিশাখা তুমি নিজেই তো এ-জীবন বেছে নিয়েছো।

আমি জয়ী নই, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাজিতও নই। কখনও খুব

মন খারাপ থাকে, মনে হয়, জিভে একটা নিমপাতা লাগানো, চোখের সামনে সব কিছুই ম্যাটমেটে। আবার কখনও সামান্য একটু ফুরফুরে হাওয়া দিলেই, এবং পকেট যদি নিতান্ত খালি না থাকে, তখন মনে হয়, আঃ বেঁচে থাকাটা কি চমৎকার ব্যাপার! কি সৌভাগ্যে এই মানুষের জন্মটা পেয়েছি! মানুষ হয়ে না জন্মালে কি টের পেতাম, বিকেল ও সন্ধেবেলার সন্ধিক্ষণে একটা অদ্ভুত আলো দেয়, সেই আলোতে বড় রহস্যময় মনে হয় এই জীবনটা। এই আলোয় ঝানু পাত্রীপক্ষরা মেয়ে দেখায়, জলের রং পর্যন্ত বদলে যায় এই আলোয়—এই রকমই এক ঠাণ্ডা আলোর মধ্যে আমি একটি নারীর পাশে বসে দেখেছিলাম, পুকুরের জল দু'ভাগ করে সাঁতরে আসছে একটা সাদা হাঁস। মন ভালো থাকার মুহূর্তে প্রায়ই আমার সেই সাদা হাঁসটার কথা মনে পড়ে।

আর, এইরকম সময়েই কোথা থেকে যেন দেবনাথ এসে উদয় হয় আমার সামনে। বিমর্ষ মুখে একটু হাসির প্রেত দেখিয়ে বলে, এই যে, ইয়ে, সুনীল, কোথায় চললে? চলো না, আমার বাড়িতে একটু চা-টা খেয়ে যাবে। বিশাখা বলছিল…কি বিশ্রী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এখন।—একদিন একটা ডবল্ ডেকারের সামনে দেবনাথকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে কি হয়?

উঁকি মেরে দেখলুম রাস্তার ওপাশে দেবনাথ নেই। তবু সাবধানের মার নেই, ভালো করে চার পাশ খুঁজে নিলুম। না, দেবনাথ সত্যিই চলে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে এসে আমি পরবর্তী বাসে উঠে পড়লুম, এবং সৌভাগ্যবশত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক নেমে যেতেই জানালার ধারে একটা বসবার জায়গা পেয়ে গেলুম।

চারটে স্টপও যেতে হলো না। হৈ-হৈ করে একদল লোক থামালো। সন্ধে পৌনে আটটায় সাধারণত ছাত্র আন্দোলন হয় না.

প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো লোক চাপা পড়েছে, কিংবা দুই পার্টির দাঙ্গা হলেও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক নিরীহ, আগের একটা বাস ব্রেক-ডাউন, তার সব যাত্রীরা এই বাসে উঠবে। জানালা দিয়ে দেখলুম, যে সব লোক ওঠার জন্য ছোটাছুটি করছে, তাদের মধ্যে আর কে, দেবনাথ!

আমি একেবারে মরমে মরে গেলুম। আমাকে লজ্জায় ফেলার জন্য এটা একটা নিয়তির চক্রান্ত ছাড়া আর কি! কোনো সন্দেহ নেই, দেবনাথ ঠিক দোতলায় উঠে আসবে, আমাকে দেখতে পাবেই, একটুও না হেসে বলবে কি, কলেজ স্ট্রীট গেলে না তাহলে। আমি যেন চোর ধরা পড়েছি! দেবনাথ নিজেই তো একটা চোর, শুধু চোর নয়, একটা মিটমিটে বদমাস! অথচ এখন আমাকেই ও প্যাঁচে ফেলবে। কেন, আমার কি হঠাৎ মত পাল্টাবার উপায় নেই? কলেজ স্ট্রীট যাবো ভেবেও রাসবিহারী এভিনিউ-র দিকে কি যেতে পারি না? আমি আমার যা খুশি করবো!

তবু আমি মুখ লুকিয়ে বসে রইলুম। বাসে বেশ ভিড় হয়ে গেছে, এখন আমাকে দেখতে না-পাবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। আমি নামবো দেবনাথের বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে। খুব মনোযোগ দিয়ে আমি দেখতে লাগলুম রাস্তার দোকানের বিজ্ঞাপনগুলো।

আমার পাশের লোকটি উঠে যেতেই আমার গা কিরকির করতে লাগলো। জানি এখানে দেবনাথ এসে বসবেই। আমি একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার পর্যন্ত সাহস নেই। দেবনাথ না, একজন মোটা মতন লোক এসে বসলো। তাও নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। শেষ পর্যন্ত যা ভেবেছিলাম, তা-ই হলো! একটু বাদেই পেছনের সিট থেকে দেবনাথ আমার পাশের লোকটিকে বললো, দাদা, আপনি একটু এখানে এসে বসবেন? আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলবো!

বন্ধু না কচু! এক্ষুণি এক ঘুষিতে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারলে আমি খুশী হতুম!

আমি হেসে কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললাম, কলেজ স্ট্রীটের বাসে যা ভিড়, তাই আর যাওয়া হলো না! যেন আমাকে দয়া করছে, এই ভঙ্গিতে দেবনাথ বললো, হ্যাঁ, বাসে বিশ্রী ভিড় তো লেগেই আছে! ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না! কলকাতার যা অবস্থা হচ্ছে দিনদিন!

সেই মুহূর্তে কলকাতা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ অবশ্য আমার মনে ছিল না, কিন্তু দেবনাথের সঙ্গে মত মেলাতেই হলো। কিছুদিন আগেও দেবনাথের একটা গাড়ি ছিল, তখন অবশ্য ট্রাম বাসের ভিড় সম্পর্কে ওর কোনো মন্তব্য শোনা যেত না।

দেবনাথ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন কোথায় যাবে? বাড়ি ফিরবে, না কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবে?

এ কথাটার মধ্যেও খোঁচা আছে। দেবনাথ বোঝাতে চাইছে, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, ওর কোনো বন্ধু নেই। আর, দেবনাথ আমার সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়লেও, আমি বন্ধু হিসেবে আড্ডা দিতে চাই না ওর সঙ্গে।

বললাম, না, বাড়ির দিকেই যাবো ভাবছি। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো আজ।

—চলো না, আমার ওখানে। এক কাপ চা খেয়ে যাবে। বিশাখা বলছিল···

—আর একদিন তো যাবো বলেছিই। আজ নয়।

—তুমি তো কলেজ স্ট্রীটে যাচ্ছিলেই। সেখান থেকে তো ন'টা সাড়ে ন'টার আগে ফিরতে পারতে না?

আর কতবার না বলতে পারে মানুষ! আমার বিরক্তি একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছে। ইডিয়েটটা কি বুঝতে পারে না যে আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। যাকে

দেখেছিলাম এক সময় অহংকারী দেবীর মতন, এখন তার মহিমা-বর্জিতা মূর্তি আমার দেখার ইচ্ছে নেই একটুও।

শেষ চেষ্টা করে বললাম, তার চেয়ে তুমিই চলো না আমার বাড়িতে। ওখানেই চা-টা খাবে। তুমি তো আমার বাড়িতে যাওনি কখনো!

—না ভাই, তা হয় না! বিশাখা একা একা থাকবে। তুমিই চলো না—তুমি তো আর বিয়ে করোনি, এই তো কাছেই—

—ভাবছিলুম, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে···

—আমার বাড়িতে যেতে যদি তোমার কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে অবশ্য জোর করবো না।

—না, না, তা নয়। ঠিক আছে, চলো—

ভদ্রতার এই তো অসুবিধে, মুখের ওপর সত্যিকথা বলা যায় না। হাজরা মোড়ের এক স্টপ আগে উঠে দাঁড়ালো দেবনাথ, ডাকলো না, শুধু তাকালো আমার দিকে। আমিও উঠে পড়লুম।

আগে ফর্সা উজ্জ্বল চেহারা ছিল দেবনাথের, এখন মুখখানা মনে হয় রক্তশূন্য। তবু তার লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা দেখে মেয়েরা সুপুরুষই বলবে। দেবনাথ কি এখনও আবার নতুন ভাবে জীবনটা শুরু করতে পারে না?

বাস থেকে নামার পর দেবনাথ বললো, দেখলে, একটা লোক কি রকম ইচ্ছে করে আমার পা মাড়িয়ে দিলে!

আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, ইচ্ছে করে কি আর দিয়েছে? ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায়নি নিশ্চয়ই।

—না, না, এক টাইপের লোক আছে তারা ইচ্ছে করে অন্যদের পা মাড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। আমার এরকম প্রায়ই হয়।

আর কিছু বললুম না। যদিও বা সেই ধরনের লোক থাকে তারা কিন্তু এ পর্যন্ত কোনোদিন আমার পা মাড়িয়ে দেয়নি। তারা ঠিক ভিড়ের মধ্যে দেবনাথের পা খুঁজে বার করে।

দেবনাথের বাড়ির রকে চার-পাঁচজন ভিখিরি শুয়ে-বসে আছে। দেবনাথ একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো, এই, যা, যা এখান থেকে! যত সব!

ভিখিরিরা আড়মোড়া ভাঙছে, সহজে যাবে না। দেবনাথ চাকরের নাম ধরে চেঁচাতে লাগলো, দামু, দামু! আবার এগুলোকে এখানে বসতে দিয়েছিস্!

এক বছরে মানুষ কত বদলে যায়। দেবনাথের গলার এই রুক্ষতা আগে কখনো শুনিনি। ভিখিরিরা রক নোংরা করে ঠিকই, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা ওখানে নোংরা কথার ফোয়ারা ছোটালে দেবনাথ কি ওরকম খেঁকিয়ে উঠতে পারতো?

দরজা খোলার পর সিঁড়িতে পা দিয়েই আমার মনে হলো, ভদ্রতা রক্ষার জন্য মানুষ কত অসহায়! আমি কেন এখানে এসেছি? আমার তো দেবনাথকে বলা উচিত ছিল, তুই একটা চোর, ঘুষখোর, ঘৃণ্যজীব। সামাজিক ভাবেই তো তোর সঙ্গে আর কারুর মেশা উচিত নয়! তোর বাড়িতে আসা তো দূরের কথা, তোর সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত নয়!—কিন্তু এসব কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারি না। মুখ তুলে দেখলাম, সিঁড়ির ঠিক মাথায় বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে এখনো তাকে ঠিক দেবী মূর্তির মতনই দেখায়।

বছর তিনেক আগে একবার এসেছিলাম দেবনাথদের বাড়িতে। তখন এ বাড়ির দামী দামী আসবাব দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এখনও সেইসব জিনিসই আছে, কিন্তু একটা কেমন যেন অগোছালো ভাব। এক সময় দারুণ ঘর সাজাবার বাতিক ছিল বিশাখার।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মুখে বেশ কিছুদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল বিশাখার সঙ্গে, সেদিন বিশাখা শুধু পর্দার কাপড়ের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। মেরুণ রঙের একটা বিশেষ সেডের পর্দার কাপড় নাকি

সারা দক্ষিণ কলকাতায় কোথাও পাওয়া যায়নি, তাই নিউ-মার্কেটে খুঁজতে গিয়েছিল। জানলায় এখনও রয়েছে সেই চাপা মেরুণ রঙের পর্দা—সোফার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে, কিন্তু অনেকদিন সোফার ধুলো ঝাড়া হয়নি ভালো করে। মাঝখানের টেবিলটা বসানো রয়েছে বাঁকা ভাবে।

দেবনাথ বললো, নিয়ে এলাম সুনীলকে ধরে!

বিশাখা বললো, কেমন আছো? অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে। মাসীমা কেমন আছেন?

বিশাখা তো আগে আমাকে আপনি বলতো। আজ হঠাৎ তুমি বলার কারণটা বুঝলাম না। হয়তো, অনেকদিন দেখা না হওয়ায় ভুলে গেছে আগেকার সম্বোধন। আমারও এরকম হয় মাঝে মাঝে —কিন্তু বিশাখার এরকম ভুল হবার কথা ছিল না।

আমি বললাম, বিশাখা, তুমি কিন্তু একটু রোগা হয়েছো।

বিশাখা একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, তুমি ছাড়া একথা এতদিন আমাকে আর কেউ বলেনি। কি খাবে?

—শুধু চা।

—চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে না? তুমি এখনও মিষ্টি খেতে ভালোবাসো? আমাদের এ পাড়ায় খুব ভালো মিষ্টি পাওয়া যায়।

—না, না, আজকাল আর মিষ্টি খাই না। তুমি আমাকে আগে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও!

—ঠাণ্ডা জল। খুব ঠাণ্ডা জল তো নেই!

দেবনাথ বিরস মুখে বললো, আমাদের ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে।

বিশাখার মুখে তখনও হাসির আভা লেগে আছে, সেটা বজায় রেখেই বললো, হ্যাঁ ভাই, আমাদের ফ্রিজটা দু'মাস হলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে!

একই কথা বললো দু'জনে, কিন্তু দু'জনের ভঙ্গি যে দু'রকম সেটা আমি লক্ষ্য না করে পারলুম না। দেবনাথের কথার সুরেই ফুটে উঠলো, ভারতের সমস্ত রেফ্রিজারেটর কোম্পানিগুলো অসৎ, কিংবা বেছে বেছে তাকেই তারা একটা বাজে ফ্রিজ গছিয়েছে। বিশাখা বলতে চায়, ফ্রিজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে, যে-কোনো সময় সারিয়ে নিলেই হয়। হয়ে উঠছে না আর কি। বিশাখার ঐ লঘু ভাবটুকুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। পৃথিবী সম্পর্কে দেবনাথের অভিযোগ শুনতেশুনতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। অবশ্য, বিশাখা কোনোদিন পরাজিত হবে, এমন আমি আশাও করিনি।

বললাম, আমার বাড়িতে তো ফ্রিজই নেই। আমার কুঁজোর জলই যথেষ্ট!

দোতলায় অনেকগুলো ঘর, ডানদিকের ঘরগুলোতে দেবনাথের ভাই সোমনাথ তার স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে থাকে। এক সময় সোমনাথের সঙ্গে আমার ভালো আলাপ ছিল, ক্রিকেট ম্যাচের মাঠে প্রায়ই দেখা হতো। একবার ভাবলাম সোমনাথকে ডাকতে বলবো। তারপরই ক্ষীণ সন্দেহ হলো, হয়তো সোমনাথরা এখন আলাদা রান্না করে খায়, দু'ভাইয়ের মধ্যে কথা বন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং সোমনাথকে ডাকলে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হতে পারে।

বিশাখা নিজেই গেল জল আনতে। দেবনাথ সেই ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বিশাখা রোগা হয়েছে বললে কেন? তোমার তাই মনে হচ্ছে?

—তাই তো মনে হলো। অনেকদিন পর দেখছি তো।

—দু'বছর ধরে ওর ওয়েট কিন্তু একই আছে।

—তাই নাকি? কিন্তু দেখে তো মনে হলো—

—কিন্তু ওজন একটুও কমে নি।

ব্যাপারটার ওপর দেবনাথ এমন অহেতুক গুরুত্ব দিচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। 'ও' বলে চেপে যাওয়াই শ্রেয় এখানে।

বিশাখা জল নিয়ে আসতেই দেবনাথ আবার বললো, বিশাখা, দু'বছরের মধ্যে তোমার ওজন একটুও কমেছে? কোনো অসুখ বিসুখও করেনি। তবু সুনীল বললো কেন—

বিশাখা আগের মতনই চাপা কৌতুকে বললো, সুনীলদা আমাকে একটু রোগা হিসেবেই দেখতে পছন্দ করে, সেইজন্য বলছে।

—সেটা আলাদা কথা।

কথার কথা হিসেবেই বলেছিলাম, তার জন্য এত! এটা ঠিক, বিশাখার সুন্দর স্বাস্থ্য আর উজ্জ্বল মুখখানির জন্য, তাকে এখনো অনায়াসেই কুমারী মেয়ে মনে করা যায়। পিঠ ভর্তি এক রাশ কোঁকড়া চুল, এত চুল শহরের মেয়েদের মধ্যে খুবই কম দেখা যায় আজকাল। দুর্গা প্রতিমার মতন টানা-টানা দুটি চোখ, টিকোলো নাকের ঠিক নিচেই, ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে একটা খাঁজ, এই রকম খাঁজ থাকলে মেয়েদের খুব বুদ্ধিমতী মনে হয়। সবচেয়ে সুন্দর বিশাখার চিবুক, অবিকল শিশুর মতন, কিংবা খুব কচি সাদা রঙের বেগুনের মতন তক্‌তকে। একটা গোলাপ ফুল ছাপা শাড়ি পরে আছে বিশাখা।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বিশাখাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি, এমন ছেলে একটিও ছিল না। বিশাখাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুনোই ছিল মুস্কিল, কেউ না কেউ সিটি দেবেই। বিশাখা শুধু সুন্দরী ছিল না, তার রূপ বড্ড চোখে পড়তো। আশ্চর্য, আজ কিন্তু বিশাখার দিকে চোখ ভরে তাকাতে পারছি না আমি। দু'এক পলক ওর চোখে চোখ রেখেই সরিয়ে নিচ্ছি।

দেবনাথের সঙ্গে বিয়ে হবার পর, সবাই বলেছিল, ভারী সুন্দর মানিয়েছে। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন কিন্তু আর মানায় না, দেবনাথ এখন অনেক নিষ্প্রভ।

বিশাখা দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলো, তুমিও চা খাবে তো!

দেবনাথ বললো, না, এত রাত্তিরে চা খেলে আমার অম্বল হয়।

আমি বললাম, বাঃ, তুমিই চা খাবার জন্য পেড়াপেড়ি করলে আমায়, এখন তুমি নিজে বলছো খাব না!

দেবনাথ বললো, তুমি দিনে অনেক কাপ চা খাও নাকি? আমার ভাই সহ্য হয় না!

—দেবনাথ তোমার আর আমার বয়েস তো প্রায় সমান!

—বয়েস দিয়ে কি আর সব কিছু বিচার করা যায়! তুমি বিয়ে করোনি, আমার বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বচ্ছর আগে।

বিশাখা বললো, বাঃ, বিয়ে করলে বুঝি মানুষ তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়?

ঠাট্টা ইয়ার্কির ধার ধারে না দেবনাথ। ঠাণ্ডা গলায় বললো, বুড়ো হয়েছি কিনা জানি না। তবে বিয়ের পর থেকেই আমার অম্বলের ধাত শুরু হয়েছে।

—মোটেই না। দু'বছর আগেও তোমার 'ওসব কিছু ছিল না। বেশী ভাবলেই মানুষের এসব অসুখ হয়।

—না ভেবে আর উপায় কি!

—আমার কিন্তু জীবনে কখনো ওসব অম্বল টম্বল হয় নি!

এতক্ষণ বাদে একটু স্বচ্ছভাবে হাসলো দেবনাথ। বললো, সেই কথাই তো বলছিলাম, তোমার কোনো অসুখ নেই, তোমার রোগা হবার কোনো কারণও নেই!

আবার সেই প্রসঙ্গ! কি ভুলই করেছিলুম ঐ কথাটা বলে। দেবনাথ এক সময় বেশ চৌকশ কথা বলতে পারতো, এখন যেন সে ইচ্ছে করেই দিন দিন বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। অন্যের বিরক্তি সৃষ্টি করেই সে আনন্দ পায়।

দাসীর হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে এসে বিশাখা রাখলো সেণ্টার টেবিলে। চায়ের কাপ আর সসারগুলো আলাদা রঙের, সাধারণতঃ এসব খুঁটি নাটি আমার লক্ষ্য করার কথা নয়, কিন্তু বিশাখার বাড়ি বলেই নজরে পড়ছে।

বিশাখা বললো, তুমি যখন চা খাবেই না, তাহলে চান করতে চলে যাও। আমি সুনীলদার সঙ্গে গল্প করি! ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

দেবনাথ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললো, হ্যাঁ ভাই, চানটা করে আসি। রোজ বাড়ি ফিরে চান না করলে আমার অস্বস্তি লাগে। যা ধুলো কলকাতার রাস্তায়! তুমি ব'সো, চলে যেও না!

—হ্যাঁ, বসছি।

আমি জানতাম, দেবনাথ আমাকে কিছুক্ষণ বিশাখার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ দেবে। কিন্তু বিশাখা নিজে থেকেই যে সে কথা বলবে, তা আশা করি নি।

দু'জনে এক সঙ্গে চুমুক দিলাম চায়ে, এক সঙ্গে কাপ নামিয়ে রাখলাম। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হলো। আমিই আবার চোখ সরিয়ে নিলাম প্রথম, চায়ের কাপে সামান্য এক টুকরো সর ভাসছে, সেটাই যেন আমার প্রধান দ্রষ্টব্য!

বিশাখা বললো, কি, সুনীলবাবু এত গম্ভীর কেন? বাবুর কি মন খারাপ?

—বিশাখা দেবী হঠাৎ আজ আমায় তুমি বললেন কেন?

—বিশাখা দেবী ক'দিন ধরেই সুনীলবাবুর কথা ভাবছিলেন কিনা। তাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল!

—মিথ্যে কথা! বিশাখা দেবীর তো আমার কথা ভাবার কোনোই কারণ নেই।

—বিনা কারণেও লোকে ভাবে। হঠাৎ হঠাৎ এক একজনের কথা মনে পড়ে যায়। যায় না?

—যখন তখন যার তার কথা ভাবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

আবার দু'জনে এক সঙ্গে চায়ের কাপ তুললাম। এক সঙ্গে চুমুক, এক সঙ্গে নামিয়ে রাখা। আবার চোখাচোখি হতেই দুজনের সামান্য হাসি। বিশাখা বললে, সুনীলদা, তুমি যখন অ্যাদ্দিন বিয়ে

করোনি, তখন আর বিয়ে করো না। বিয়ে করলেই যদি ছেলেরা বুড়িয়ে যায়, কিংবা অম্বলের অসুখ হয়, তা হলে ছেলেদের পক্ষে বিয়ে না করাই তো ভালো!

—ঠিক আছে। এখন থেকে মেয়েরাই শুধু বিয়ে করবে। ছেলেরা আর বিয়ে করবে না!

বিশাখা মুখ ভর্তি চা নিয়ে এমন হাসতে লাগলো যে ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে আরকি। আমি আমার মুখের সামনে হাত আড়াল করে ত্রস্তভাবে বললাম, এই, এই, কি হচ্ছে কি।

কিন্তু বিশাখার অকুণ্ঠ হাসি দেখতে আমার ভালোই লাগছিল। আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতেই ভয় পাচ্ছিলাম এই আশংকায়, যদি সে আগের মতন প্রাণবন্ত না থাকে? দেবনাথের ছোঁয়াচ কি ওর একটুও লাগবে না? কিন্তু দেবনাথের প্রসঙ্গ বিশাখার কাছে এখন মোটেই তোলার ইচ্ছে নেই আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, বিশাখা, তুমি আজকাল বাইরেটাইরে বেরোও না? কখনো তো দেখি না! মাঝে মাঝে দেবনাথের সঙ্গে দেখা হয়—

মনে মনে হিসেব করলো বিশাখা। তারপর বললো, প্রায় ছ'মাসের বেশী—একটাও সিনেমা দেখিনি, কোথাও বেড়াতে যাই নি!

—কেন?

—এমনিই! ভালো লাগে না।

—সারা দিনরাত বাড়িতে বসে থেকে কি করো?

—জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কবে সুনীলদা আসবে, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বলবে!

ঠাট্টা ইয়ার্কিরই সম্পর্ক ছিল আমাদের। আমি বিশাখার ব্যর্থ প্রণয়ী নই। পাশাপাশি বাড়ি ছিল এক পাড়াতে, বিশাখার প্রেমে হন্যে হয়ে হুড়োহুড়ি করতো সাত আটটা ছেলে, তাদের দলে ভিড়ে

পড়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমার ছোট বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, আমাদের বাড়িতে আসতো মাঝে মাঝে। বিশাখার আড়ালে যখন বিশাখার নিন্দে হতো আমাদের বাড়িতে, তখন তাতে মাঝে মাঝে আমিও যোগ দিয়েছি। আমার মা বলতেন, রংটা ফর্সা বলে মেয়েটা বড্ড দেমাকী হয়ে গেছে, মাটিতে যেন পা পড়ে না। ওর বাবা মা আবার বেশী আস্কারা দিয়ে মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। আবার বিশাখা বাড়িতে এলে, মা-ই বলতেন, তুই তো আমার মেয়ের মতন, তোর আবার লজ্জা কি রে! আমার বোনের নাম অঞ্জনা, কিন্তু ওদের দু'জনকে সবাই বলতো ললিতা-বিশাখা।

আমার বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পরও বিশাখা মাঝে মাঝে আসতো আমাদের বাড়িতে। আমি ওকে দু'একদিন সিনেমায় নিয়ে গেছি, লেকেও গিয়েছিলাম কয়েকবার। এর জন্য অবশ্য ছাদ থেকে চিঠি ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হয়নি আমাদের, সিঁড়ির পাশে নিরালায় দাঁড়িয়ে গাঢ় স্বরে কথা বলতে হয়নি। বিশাখাই এসে কোনো বিকেলে বলতো, সুনীলদা, তুমি বড্ড কিপ্টে হয়ে যাচ্ছো, গ্রেগরি পেকের বইটা তুমি দেখাও না আমাকে! মাসীমা, আপনি একটু বলুন তো! ছেলেবেলা থেকেই বিশাখা নাম-করা সুন্দরী, সে ধরেই নিয়েছিল, তাকে প্রায়ই কেউ না কেউ সিনেমা দেখাবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে। অনেকেই যেত। কিন্তু বিশাখার চরিত্রে একটা ঝকঝকে দিক ছিল, এই জন্য কেউ তার অপবাদ ছড়ায় নি।

আমাদের বাড়িতে আমরা সবাই জানতাম, যতই ছেলেটেলের সঙ্গে ঘুরুক, বিশাখার বিয়ে হবে বাড়ির পছন্দমত কারুর সঙ্গে। বিশাখাও তাতে আপত্তি করবে না। আজকাল আর কোনো ধনী পরিবারের মেয়ে হঠাৎ কোনো গরীব স্কুল মাস্টারের প্রেমে পড়ে না। কিংবা একটু-আধটু প্রেম হলেও বিয়ে করতে চায় না।

বিশাখার প্রেমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাছোড়বান্দা ছিল মনুজেশ। মনুজেশকে আমিও চিনতাম, আমার মাসতুতো ভাইয়ের

বন্ধু ছিল সে। আমাদের গলির মোড়ে তাকে নিয়মিত দেখা যেত। বিশাখার প্রেমে সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনুজেশ তখন জানতো না, একটি মেয়েকে শুধু ভালোবাসাই তাকে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়! মনুজেশ আমাকে বলতো, ওর হয়ে একটু চেষ্টা করতে।

কিন্তু বিশাখার তখন ঠিক প্রেমের চেতনা ছিল না। ছেলেদের সঙ্গে বেড়াবে, গল্প করবে, হাতে হাত রাখবে, এই কি প্রেম? বড় জোর কেউ জড়িয়ে ধরতে চাইলে বলবে অসভ্য! বিয়ে তো অন্য ব্যাপার।

হলোও তাই, বিশাখার বাড়ি থেকে পছন্দ করা হলো দেবনাথকে। বিয়ের কিছুদিন আগে বিশাখার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো, তারা এখন প্রেমিক-প্রেমিকার মতন ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। তখন বেশ চালু ছেলে ছিল দেবনাথ, একটা নীল রঙের গাড়িতে চেপে এসে হর্ন দিত বিশাখার বাড়ির সামনে।

আমার সঙ্গে আবার দেবনাথের পরিচয় বেরিয়ে পড়লো, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, খুব বন্ধুত্ব ছিল না যদিও, কিন্তু মুখ চিনতাম। এমন অনেকদিন হয়েছে, দেবনাথ এক সঙ্গে আমাকে আর বিশাখাকে গাড়িতে চাপিয়ে বেড়াতে কিংবা রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে গেছে। বিশাখা তার অন্য প্রেমিকদের নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে গল্প করতো আমার কাছে। কিন্তু দেবনাথ বিষয়ে কিছু বলেনি। যথেষ্ট ছেলেমানুষ ছিল তখনও, কিন্তু এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিল যে, যাকে বিয়ে করবে, তাকে খুশী করে চলতে হয়। তখন দেবনাথের সামনে বিশাখা আমাকে আপনি বলতো।

বিশাখাকে আমি কোনোদিন বিরলে প্রেম জানাইনি, সুতরাং তার বিয়েতে আমার মন কেমন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, যে কোনো কুমারী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই যে কোনো যুবকের একটু বুকটা টন্‌টন করে ওঠে। সাত পাকের সময় আমিই

পিঁড়ি ধরে ঘুরিয়েছিলাম বিশাখাকে। পড়ে যাবার ভয়ে কিংবা কিছু একটা সান্ত্বনা পাবার জন্য আমার হাত চেপে ধরেছিল বিশাখা। বিয়ের দিন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল বিশাখাকে, সেদিন যে আমার একটু একটু দুঃখ হয়েছিল, সেটা ব্যর্থ প্রেমিকের মন খারাপ নয়, অসম্ভব সুন্দর কিছু দেখার বেদনা।

আমি বললাম, এখন বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আবার অন্যদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে কেন ?

—বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি আমি বদলে গেছি নাকি ?

—আমার বোন অঞ্জনা তো দুটো বাচ্চা হবার পর রীতিমত গিন্নী হয়ে গেছে !

বিশাখা একটু দুঃখিতভাবে বললো, অঞ্জনা আর আমাকে এখন চিঠি লেখে না। ও এখন কানপুরেই আছে তো ? আমি আশা করেছিলাম, এই সময়ে আমাকে অনেকেই চিঠি লিখবে।

—অঞ্জনা বোধহয় কিছু জানে না ! ও নিজের সংসার নিয়েই এত ব্যস্ত ! তোমার তো ছেলেপুলে হয়নি, তুমি বুঝবে না।

বিশাখা আবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

হাল্‌কা ভাব আনার জন্য আমি আবার বললাম, তোমার সব-আগেকার প্রেমিকদের সঙ্গে আর দেখা হয় না ?

সংক্ষিপ্তভাবে বিশাখা জানালো, না!

—মনুজেশের সঙ্গেও আর দেখা হয় না। ও বেচারা বড্ড আঘাত পেয়েছিল!

—মনুজেশের বিয়ে হয়নি ?

—আমি তো যদ্দুর জানি, এখনো বিয়ে করে নি।

বিশাখা ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বলতে চাইলো না! একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, মাসীমা কেমন আছেন ?

—ভালো।

—আর তোমার ছোট ভাই রঞ্জু ?

—ও তো এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি খ‍ুঁজছে।

—জানো, রঞ্জ‍ুর সঙ্গে একদিন আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, ও আমাকে চিনতেই পারলো না। দেখেও না দেখার ভাব করে এড়িয়ে গেল!

আমি বিব্রতভাবে বললাম, যাঃ সে কি! ও নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। দেখলে চিনতে পারবে না কেন?

বিশাখা হঠাৎ চটে উঠলো। ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, বাজে কথা বলো না! আমি জানি আজকাল সবাই আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। আমি-সেইজন্যই তো আজকাল আর বাইরে বেরোই না! তুমিও ঐজন্যই আসো না আমি জানি!

– না, বিশাখা, সত্যি বিশ্বাস করো, আজকাল অফিসের কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়! প্রায়ই যেতে হয় ট‍ুরে।

এক পলকের মধ্যে বিশাখার স‍ুন্দর ম‍ুখখানা কি রকম অসহায় হয়ে গেল। সাঁতার জেনেও মান‍ুষ যখন সম‍ুদ্রে ডুবে যায় তখন তার ম‍ুখের চেহারা বোধহয় এই রকম হয়। বিশাখার মতন মেয়েকে দেখেও যে চেনা লোকেরা এড়িয়ে যেতে চায়, একথা অকল্পনীয়, মর্মান্তিক, নিষ্ঠ‍ুর হলেও কিছ‍ুটা যে সত্যি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা এড়িয়ে যেতে চায়, তাদেরও খ‍ুব দোষ দেওয়া যায় না, তারাও পড়তে চায় না একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে! অবশ্য, বিশাখার এই রকম অবস্থার স‍ুযোগ নিয়ে কিছ‍ু লোক যে তার দিকে বেশী বেশী উৎসাহ দেখাবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশাখার আত্মসম্মানজ্ঞান এত প্রবল যে তাদের সে গ্রাহ্যই করবে না নিশ্চিত। এখন বিশাখাকে যারা বেশী সমবেদনা দেখাতে আসবে, তাদেরও সে ঘ‍ৃণা করবে।

একট‍ুক্ষণের মধ্যেই বিশাখা নিজেকে সামলে নিল। নম্রভাবে বললো জানি,অফিসে তোমার উন্নতি হয়েছে। এখন তো তুমি ব্যস্ত থাকবেই।

—না, না, এমন কিছু উন্নতি নয়! এই একটা পোস্ট খালি হয়েছিল।

আমার চাকরিতে উন্নতির জন্য আমার একটু লজ্জা করতে লাগলো! দেবনাথের এই অবস্থায় আমার উন্নতি হওয়াটাও যেন একটা অপরাধ। আমি একটু অস্থিরভাবে বললাম, দেবনাথ এখনো এলো না! কতক্ষণ ধরে চান করছে?

—ওর প্রায় একঘণ্টা লাগে! বাতিক হয়েছে তো আজকাল!

—বিশাখা, আজ আমি উঠি। অনেক রাত হয়ে গেল।

—মোটে ন'টা বাজে। আর একটু বসো! সুনীলদা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

বিশাখা কি জিজ্ঞেস করবে, আমি জানি। এতক্ষণ মনে মনে এর জন্যই ভয় পাচ্ছিলাম। কত সাবধানে কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু আর তো উপায় নেই। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। এখন এক দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায় না?

কোনোক্রমে মুখে হাসি এনে বললাম, কি কথা? তোমার জন্য এখনও আমার কষ্ট হয় কিনা?

—না, ঠাট্টা নয়—

—আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না।

—না, তুমি আগে বলো, তুমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করো?

—কোন্ ব্যাপারটা?

—তুমি ঠিক জানো। তুমিও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছো?

—না, মানে, দেবনাথকে আমি যে-রকম চিনতাম, তাতে সত্যিই তা বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া, তুমি নিজেই তো এ ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে।

—সে কথা নয়, তুমি নিজের কথা বলো। তুমি নিজে বিশ্বাস করো কিনা! এ কখনও সত্যি হতে পারে?

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল খবরটা। চেনাশুনো

তো এমন কেউ নেই যে দেখেনি। সি বি আই-এর তদন্তের ফলে কলকাতায় এগারোজন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, দেবনাথ তার মধ্যে একজন। দেবনাথের বাবা ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন এক সময়, বাবার জোরেই বড় চাকরি পেয়েছিল। দেবনাথের বাবা রিটায়ার করার পরের মাসেই মারা যান। দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রায় সাতষট্টি হাজার টাকার অপব্যবহারের অভিযোগ দেবনাথের নামে। ফলাও করে ছাপা হয়েছিল এই সব। অফিসারদের ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটা এতই সাধারণ এখন যে, কারুর নামে ছাপার অক্ষরে ঐ অভিযোগ বেরুলে কে আর অবিশ্বাস করবে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও অনেকেরই ওরকম ঘুষখোর অফিসার-টফিসার থাকে, তাতে কিছু যায়-আসে না, কিন্তু যে ধরা পড়ে, সেই ঘৃণ্য।

দেবনাথের অবশ্য এখনও চাকরি যায়নি। সাসপেন্ডেড হয়ে আছে, সি বি আই-র রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে কেস তুলেছে হাইকোর্টে। দু মাস অন্তর তার ডেট পরে। জিনিসটা যে কতখানি মিথ্যেভাবে সাজানো এবং তাকে অপদস্থ করার জন্য সহকর্মীদের চক্রান্ত, সে কথা দেবনাথের মুখে বহুবার শুনতে হয়েছে আমাকে। মিথ্যে যে হতে পারে না তা নয় কিন্তু তারপর থেকেই কেন এরকম বিবর্ণ পরাজিত হয়ে গেল দেবনাথ? তার সততা যদি প্রশ্নের অতীত হয়, তা হলে সাহসের সঙ্গে সে কেন রুখে দাঁড়াতে পারছে না? তার নিজের ব্যবহারেই সে সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাচ্ছে।

আমি বিশাখাকে বললুম, দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও একজন সরকারী অফিসার। আমার এ সম্পর্কে এখন কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়! মামলা চলছে, মামলার ফলাফলেই আসল ব্যাপারটা জানা যাবে।

বিশাখা একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, তোমাকে কি আজ ও জোর করে ধরে এনেছে?

সত্যি কথাটা সব সময় তো বলা যায় না। আমার নিজের চাকরির স্বার্থে এবং আমার বিবেক অনুযায়ী, দেবনাথের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তার ঐ পরাজিত মনোভাব মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, সেই-জন্যই আমি ওকে এড়িয়ে চলতে চাই।

চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে বললাম, না, না, আজ বাসে ওব সঙ্গে দেখা হলো ভাবলাম অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি তাই চলে এলাম। জোর করে আনবে কেন ?

—ভদ্রতা রাখার জন্য বলছো ত ?

আমি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছি, তবু বিশাখার কাছে নকল অভিমান দেখিয়ে বললাম, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না!

—আমি কয়েকদিন থেকেই তোমারি কথা ভাবছিলাম। মনে মনে আশা করছিলাম, হয়তো তুমি একদিন আসবে।

—এই তো এলাম। আমি ঠিক টেলিপ্যাথিতে খবর পেয়েছিলাম।

আমার হাসির উত্তর দিল না বিশাখা। গম্ভীরভাবে বললো, আমি সত্যি ঘটনাটা জানতে চাই।

—তুমি ওর স্ত্রী। তোমারই তো আসল কথাটা জানা উচিত।

—আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলে নি। কোনোদিন তো ও বাড়িতে খুব বেশী টাকা আনে নি।

—বিশাখা, তুমি তো টাকা-পয়সার হিসেব কিছুই বুঝতে না।

—এটুকু অন্তত বুঝি! তোমার মেসোমশাই দিল্লীতে হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি না? এখনও আছেন, না রিটায়ার করেছেন?

—এখনও আছেন।

—সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশান তো হোম ডিপার্ট-মেণ্টেরই অধীনে? তাই না? সুনীলদা, তুমি একটু তোমার মেসোমশাইকে অনুরোধ করে সঠিক খবরটা জেনে দেবে ?

এবার আমার গম্ভীর হবার পালা। নোখ দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললাম, তুমি এইজন্যই ক'দিন ধরে আমার কথা ভাবছিলে ?

ভারী কাতরভাবে হাসলো বিশাখা। এরকম কাতরতা ওর মুখের সঙ্গে মানায় না। কুণ্ঠিতভাবে বললো, যদি বলি হ্যাঁ, তুমি খুব আহত হবে ?

—না, না, আহত হবো কেন ?

—সত্যি কথা বলতে কি, অনেকটা এইজন্যই। তা ছাড়া কোথা থেকে একটা বিশ্বাসও এসে গিয়েছিল, আর সবাই আমাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও তুমি করবে না। এক সময় তো আমরা তিন-জনেই বন্ধু ছিলাম। তোমাকে এমনিতেও দেখতে ইচ্ছে করতে পারে তো।

—আমার মেসোমশাই দারুণ কড়া লোক। অফিসের কাজের ব্যাপারে মাথা গলানো একদম পছন্দ করেন না!

—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কোনো অন্যায় সুযোগ চাইছি না। দয়াও চাই না। আমি চাই শুধু সত্যি কথাটা জানতে।

একবার আমার বলতে ইচ্ছে হলো, বিশাখা, তুমি শুধু শুধু দেবনাথকে আঁকড়ে থাকতে চাইছো। দেবনাথ ফুরিয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে—দোষী বা নির্দোষ যাই হোক, দেবনাথ আর আগেকার অবস্থা ফিরে পাবে না। তোমার মন এখনও এমন তাজা, স্বাস্থ্য এত সুন্দর—তুমি দেবনাথকে ছেড়ে চলে যাও!

কিন্তু এ কথা বলা যায় না। কোনো মেয়েকে কোনো পুরুষ বলতে পারে না, স্বামীকে ছেড়ে তুমি চলে যাও, বলতে হয়, স্বামীকে ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো! কিন্তু আমি তো সে কথা বলতে চাই না! আমি তো বিশাখা সম্পর্কে ওরকম ভাবে কখনও ভাবি নি! তা ছাড়া বিশাখা দারুণ জেদী মেয়ে, আমি ওকে চিনি, অন্য সময় দেবনাথের ওপর রাগ করে ও হয়তো চলে যেতে পারতো

কিন্তু দেবনাথকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে ও পালাবে না। সে স্বভাব ওর নয়। অসহায় মানুষকে ছেড়ে যেতে বোধ হয় কোনো মেয়েই পারে না!

বললাম, ওর যদি সত্যিই কোনো দোষ না থাকে, তাহলে তো মামলায় জিতবেই। এরকম অনেক দেখা গেছে, মামলায় জেতার পর আবার চাকরি ফিরে পেয়েছে।

—আমি চাকরির কথা ভাবছি না। মামলায় কি সব নির্দোষ লোকেরা ছাড়া পায়? সব দোষী শাস্তি পায়? সে কথা যাক, মামলা কবে শেষ হবে তারই তো ঠিক নেই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিনা বলো।

কথা এড়াবার জন্য বললাম, শোনো বিশাখা, তুমি দেখতে পাচ্ছো না, দিন দিন দেবনাথ কিরকম মনমরা হয়ে যাচ্ছে। এত ভেঙে পড়ার কি আছে! কত সত্যিকারের চোরও তো আজকাল বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বিশাখা কঠোরভাবে বললো, কোনো সত্যিকারের চোরের সঙ্গে আমি একসঙ্গে থাকতে চাই না। তা হলে যে-সব শাড়ি আমি পরেছি, যে-সব গয়নায় সেজেছি—সেগুলোর জন্য আমার শরীর জ্বলে যাবে। সুনীলদা, তুমি তোমার মেসোমশাই-এর কাছ থেকে আমাকে সত্যিকারের ব্যাপারটা জেনে দেবে কিনা আগে বলো? শুধু জেনে দাও, সত্যিকারের কোনো প্রমাণ আছে কিনা।

—দেখো, এসব মারাত্মক ব্যাপার তো চিঠিতে লেখা যায় না! তাহলে আমাকে দিল্লী যেতে হয়।

বিশাখা উঠে এলো আমার পাশে। আমার হাতের ওপর হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললো, তুমি আমার জন্য একবার যাবে?

—শোনো বিশাখা, ব্যাপারটা—

—না, তুমি আমাকে বলো আগে, তুমি আমার জন্য এটুকু করবে কিনা?

আমার হাতের ওপর রাখা বিশাখার হাত। নরম কোমল আঙুল, নোখে লালচে স্বাস্থ্যের আভা, অনামিকায় একটা পান্না বসানো আংটি। বিয়ের দিন সাতপাকের সময় যখন পিঁড়ি ধরে ঘোরাচ্ছিলাম, তখন এই আংটি পরা হাতে বিশাখা আমার হাত চেপে ধরেছিল। মানুষ পারে এরকম অনুরোধ উপেক্ষা করতে? বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগলো, নাকে এসে লাগছে বিশাখার শরীরের নিজস্ব ঘ্রাণ।

বললাম, আচ্ছা যাবো—

—কথা দাও?

—কথা দিলাম!

—এজন্য আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসবো!

—ছিঃ, বিশাখা, এসময় ভালবাসার কথা বলে না।

এবার আমার অসৎ হবার পালা। এখন আমাকে অনেক মিথ্যে কথা বলতে হবে, পালিয়ে বেড়াতে হবে বিশাখার কাছ থেকে। বিশাখাকে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সে কথা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মেসোমশাই আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আমার মাসতুতো বোন রুন্টি একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চানকে বিয়ে করেছে, মেসোমশাই প্রায় সারা ভারতের পুলিসবাহিনী নিয়োগ করে সেই বিয়ে আটকাতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। সেই সময় আমি রুন্টিকে খানিকটা সাহায্য করেছিলাম, সেই থেকে রাগ। আমি দিল্লীতে কখনও গেলে হোটেলে উঠি, মেসোমশায়ের বাড়িতে উঠি না। মাসীমা মারা যাবার পর, মেসোমশাই কঠোর সন্ন্যাসীর মতন কৃচ্ছ্র জীবন-যাপন করছেন, অবশ্য ঈশ্বরের বদলে তাঁর সাধনা চাকরির উন্নতির জন্য। সেন্টারে হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি হয়েছেন, আশা আছে, রিটায়ার করার আগে সেক্রেটারি হবেন।

এসব কথা বিশাখাকে বলা যেত না। ও তা হলে ধরেই নিত, আমি নিছক ওকে এড়াবার জন্যই এগুলো বানিয়ে বলছি। সত্যি কথাও অনেক সময় খুব দুর্বল শোনায়।

তা ছাড়া, মেসোমশায়ের সঙ্গে যদি আমার ভালো সম্পর্কও থাকতো, তা হলেও, চাকরির ব্যাপারে সামান্য গোলমাল হতে পারে, এরকম কাজ উনি কিছুতেই করতেন না। সি বি আই-এর গোপন রিপোর্ট বাইরের কারুর কাছে, বিশেষত অভিযুক্ত লোকের কাছে ফাঁস করে দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। এ খবর জানতে চাইলে মেসোমশাই হয়তো আমাকেই পুলিসে ধরিয়ে দিতেন!

এটা আমার চাকরির পক্ষেও বিপজ্জনক। দিল্লী না হোক, কলকাতার ছোট ডিপার্টমেন্টেও আমার দু'একজন চেনা আছে। কিন্তু সেখানে খোঁজখবর নেবারও দারুণ ঝুঁকি আছে। একজন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের জন্য আমি তদ্বির করছি এ কথা কেউ প্রকাশ করে দিলে, আমার অবস্থা কি হবে? আমাকেও ঐ দলে ফেলা হবে না? খবরের কাগজের লোকেরা মুখিয়ে আছে, তাদের চর আছে সব সরকারী অফিসে। যে কেরানীটি আমাকে ফাইল দেখাবে, সে-ই হয়তো জানিয়ে দেবে খবরের কাগজে। বেশির ভাগ খবরের কাগজ কেচ্ছা ছাপাতে খুব উৎসুক, পাঠকরাও ঐ সবই পড়তে চায়। একবার যদি কারুর নামে স্পাই কিংবা ঘুষখোর অপবাদ রটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়রাও পুরো-পুরী অবিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া বিশাখার জন্য আমি এই সব ঝুঁকি নেবো কেন, আমি তো বিশাখার প্রেমিক নই! দেবনাথ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও নেই।

যত রাগ পড়লো দেবনাথের ওপর। তুমি নিজেই এই কাণ্ডটি বাধিয়েছো, নিজে এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে পারো না। তা নয়, আমাকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে বউয়ের সামনে ভজিয়ে দিয়ে নিজে ঢুকে রইলে বাথরুমে। মহা হারামজাদা।

একটি। সুন্দরী বউকে দিয়ে বন্ধুদের ব্ল্যাকমেইল করানো। তুমি ঘুষ খেয়েছো, আর সি বি আই-এর কোনো অফিসার ঘুষ খায় না? ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যদি মেরেই থাকো, তার থেকে কিছু ঘুষ দিলে পারতে। নাকি সে বেলায় কিপ্টেমি করেছিলে? শুধু লেবোরাম দেবো না দাস হয়ে থাকতে চাও? কিন্তু যদি অত টাকাই নিয়ে থাকে, তা হলে অতগুলো টাকা দিয়ে দেবনাথ করলো কি?

দিন চারেক বাদে অফিস থেকে দুপুরবেলা ফোন করলাম মনুজেশকে। মনুজেশ সব সময়ই বেশ উৎফুল্ল থাকে। একটা মার্কেণ্টাইল ফার্মে চাকরি করে, মদ খায়, মেয়েদের সম্পর্কে বেশ তরল। এককালের সেই গদগদ প্রেমিকটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

—মনুজেশ, হাতে কাজ কিরকম? আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে নাকি?

—হ্যালো, ওল্ড বয়। হঠাৎ নেমন্তন্ন যে!

—এমনিই, আজ শখ হলো চীনে খাবার খাবো। একা একা তো খাওয়া যায় না।

—তা বলে আমার সঙ্গে? এরকম লাভলি ওয়েদার, এসময় তো কোনো মেয়ে বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে যাওয়া উচিত।

—আমি আর মেয়েবন্ধু কোথায় পাবো বলো?

—কেন, গত বছর যে একটি ম্যারেড মেয়ের সঙ্গে খুব ঘুরতে দেখতাম?

—আরে, সে তো আমার মাসতুতো বোন রুণি!

—মাসতুতো বোন? আপন, না দূর সম্পর্কের? চোরে চোরে যেমন মাসতুতো ভাই হয়, সেরকম—

—বাজে কথা ছাড়ো, তুমি আসবে?

—শুধু খাবার খাওয়া হবে? এরকম ওয়েদার, একটু হুজুমি কিছু পানটান করা হবে না।

—সে তুমি খেতে পারো ইচ্ছে হলে এখন সওয়া একটা বাজে, তা হলে ঠিক দু'টোর সময়—

মনুজেশকে ডাকার আগেও আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বিশাখার কাছে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারবো না ঠিক করে ফেলেও বিশাখার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। একা একা নিজের সঙ্গে তর্ক করছিলাম অনবরত। দেবনাথের জন্য কি বিশাখাকেও দোষী করা যায়? সে কেন এর ফল ভোগ করবে? ওর মতন অমন একটা সুন্দর প্রাণবন্ত মেয়ে—দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকবে, লোকের সঙ্গে মিশতে লজ্জা পাবে কেন? কিন্তু বিশাখার জন্য আমি কি করতে পারি? বিশাখা, তুমি আমায় মিথ্যেবাদী করলে কেন? কেন আমার শান্তি নষ্ট করলে? মানুষ আজকাল নিজের সমস্যা নিয়েই সামলাতে পারে না, অপরের সমস্যা কেন ঘাড়ে চাপানো!

মনুজেশকে দেখেই আমার মাথায় আইডিয়াটা খেলে গেল। মনুজেশ আজকাল কিরকম স্মার্ট হয়েছে, টেরিলিনের স্যুটটা পরেছে নিখুঁত কায়দায়, কি অবহেলার সঙ্গে সিগারেটটা ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, অথচ পড়বে না! কমার্শিয়াল ফার্মে ঢুকলে ক্যাবলারাও চালাক হয়ে যায়। আর সরকারী অফিসে আমাদের তো যা অবস্থা, দিন দিন বেড়ালের মতন গোঁফ দিয়ে ফিক ফিক করতে হয়।

মুরুব্বি চালে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে মনুজেশ বললো, কি খবর বলো!

—খবর আর কি! অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই।

—তুমি তো আর পার্ক স্ট্রীট পাড়ায় আসো না! তা হঠাৎ আমার কথা মনে পড়লো যে?

—একজনের মুখে তোমার নাম শুনলাম কিনা!

—একজন? কে একজন?

—বিশাখা।

মনুজেশ এমনভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন ও আমাকে সেই মুহূর্তেই খুন করতে চায়, কিংবা আমার মধ্যে ও অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। ওর মুখে যে বুদ্ধির চাকচিক্য কিংবা সৌখিনতার জৌলুস ছিল—সেটা সম্পূর্ণ মুছে গেল, ফুটে উঠলো একটা সরল লাজুক মুখ, তাতে সামান্য বেদনার চিহ্ন। কিন্তু তিরিশ বছর বয়েস পেরিয়ে গেলে মানুষ এই ধরনের সরল মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। মনুজেশও একটু লজ্জা পেয়ে, সেটা কাটানোর জন্য তুখোড় কায়দায় টুস্‌কি দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো, ডেকে বললো, হামারা লিয়ে এক বিয়ার, একদম চিল্‌ড হোনা চাইয়ে, আউর সাহাবকো লিয়ে—সুনীল তুমি কি খাবে ?

—আমি ওসব খাবো না। আমি সুপ খাবো। চিকেন্‌ উইথ কর্ন। বেয়ারা চলে যাবার পর মনুজেশ নিচু গলায় বললো, বিশাখার সঙ্গে কোথায় দেখা হলো ?

– কয়েকদিন আগে বিশাখার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—তোমার সঙ্গে বুঝি ওর যোগাযোগ আছে এখনও ?

—হ্যাঁ। দেবনাথও তো আমার বন্ধু !

—ওর নামে কি একটা স্ক্যান্ডাল বেরিয়েছে না কাগজে ?

—তুমি জানো তা হলে ?

—খবরের কাগজে বেরোয় তো লোককে জানাবার জন্যই ! তা ছাড়া আমাদের অফিসে মিত্তিরের কাছে শুনেছি। মিত্তিরের সঙ্গে ওর তো আবার প্রায়ই রেসের মাঠে দেখা হয় কিনা !

—দেবনাথ রেস খেলে ?

—তুমি জানো না ? আমিও তো দু'একদিন গিয়েছিলাম, তখনও ওকে দেখেছি।

দেবনাথের এ পরিচয়টা আমার সত্যিই জানা ছিল না। রেস খেলার ব্যাপারটা যেন দেবনাথের চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। সন্দেহ

কি, দেবনাথ প্রতিবার ভুল ঘোড়ার ওপরই বাজি ফেলেছে। যে হেরে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাকে কে জেতাবে? কিন্তু মনুজেশ মিথ্যে কথা বলছে না তো? প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীকে কেউই পছন্দ করে না। তার সম্পর্কে নিন্দে ছড়ানোই নিয়ম।

আমি সাবধান হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমারও রেসটেস খেলার অভ্যেস আছে নাকি?

মনুজেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, মাঝে মাঝে যাই মাঠে, স্পোর্টস হিসেবে দু'-একটা খেলি। এর জন্য দেবনাথের মতন আমাকে অফিসের টাকা মিসঅ্যাপ্রপ্রিয়েট করতে হয় না অবশ্য! হি ইজ এ সিলি অ্যাস্।

আমি এবার হৃষ্টভাবে হাসলুম। বললুম, তোমার এখনও ঈর্ষা আছে দেবনাথ সম্পর্কে। ঐ সব ঈর্ষাটির্ষা কিন্তু বাচ্চা বয়েসেই মানায়।

মনুজেশ একটু অবাক হয়ে বললো, ঈর্ষা! ধ্যাৎ! দেবনাথ সম্পর্কে আমার মায়া হয়।

—আচ্ছা, দেবনাথের তো অনেক গুণ ছিল, তবু সে এরকম হয়ে গেল কেন?

—তার কারণ, ও ওর স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারেনি।

—তোমাকে বুঝি সে কথা ও কানে কানে বলে গেছে?

—একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারা যায়! ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো, বিশাখা ওর পক্ষে মাপে একটু বড় হয়ে গেছে—দেবনাথের যতখানি ভালোবাসার ক্ষমতা, বিশাখার দাবি তার চেয়ে অনেক বেশী। দেবনাথ বেচারা তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল!

—রাবিশ! দাম্পত্য ব্যাপারটা অতখানি জটিল নয়!

—তুমি সব জেনে বসে আছো! ক'বার বিয়ে করেছো তুমি? আমি নিজে বিয়ে না করলেও জানি।

—কিন্তু বিশাখার মধ্যে অসাধারণত্ব কি আছে? বিশাখা বেশ সুন্দরী কিন্তু ওরকম সুন্দরী মেয়ে ঢের ঢের আছে।

—সেরকমভাবে বিচার করতে গেলে অবশ্য অসাধারণত্ব কিছু নেই।

—বিয়ের সময় ছেলে হিসেবে দেবনাথও মোটেই খাবাপ ছিল না।

—দেখো, আমারও একটা ভদ্রতাবোধ আছে। দেবনাথ যেহেতু বিশাখার স্বামী, সেই জন্যই তার আমি কোনোরকম নিন্দে করতে চাই না—তা হলে সবাই ভাববে আমি ঈর্ষা থেকে বলছি। কিন্তু যে লোক বউকে খুশী করার জন্য অফিসে টাকা চুরি করে—

আমি মনুজেশের মুখের সামনে হাত তুলে বললাম, শোনো, শোনো, মনুজেশ, উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছো কেন? আস্তে কথা বলো! প্রথম কথা, দেবনাথ যে টাকা চুরি করেছে, সেটা এখনও প্রমাণিত হয় নি—সুতরাং তোমার ওভাবে বলা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে আরও ঢের ঢের লোক অফিসে টাকা চুরি করে, তারা সবাই বউয়ের কথা ভাবে না।

—খবর নিয়ে দেখো গে, তারা সবাই বউকে খুশী করার জন্যই যত সব অপকীর্তি করে। এর মধ্যে দু'ধরনের লোক হচ্ছে রিয়েল গাধা—এক, যারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, আর এক হচ্ছে—যারা বুঝতেই পারে না, তাদের বউ এতে সত্যি খুশী হবে কিনা। বিশাখা যে এতে খুশী হতেই পারে না—সেটা বুঝতে পারেনি দেবনাথ।

—কিন্তু দেবনাথেরও অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল।

—তুমি আমার পয়েন্টটাই বুঝতে পারলে না।

আমি দুজনের জন্য খাবার অর্ডার দিলাম, মনুজেশ আর এক বোতল বিয়ার নিল। মনুজেশের কথা শুনে যতই বুঝতে পারছি যে বিশাখা সম্পর্কে এখনও তার দুর্বলতা আছে, এখনও সে বিশাখার কথা তীব্রভাবে ভাবে—ততই আমার মাথায় পরিকল্পনাটা দানা বাঁধছে। আমার মুক্তির উপায় আমি পেয়ে গেছি।

মনুজেশ বললো, তা যাক গে। বিশাখা আমার কথা কি বললো বলো!

—বিশাখার এই বিপদের সময় কি তোমার একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল না?

—এটা এমন ধরনের বিপদ যাতে অন্য কেউ সহানুভূতি জানাতে পারে না। কারুর ছেলেপুলে মারা গেলেই সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাই না আমরা। আর এখানে গিয়ে কি বলবো, আহা, তোমার স্বামী টাকা চুরি করেছে, তাতে আর কি হয়েছে। আফটার অল, এটা একটা সামাজিক অন্যায়, আমরা কেউ এতে সমর্থন জানাতে পারি না।

—সেটা ঠিক। দেবনাথের সঙ্গে আমাদের কোনোরকম সংস্পর্শই রাখা উচিত নয়। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, এজন্য বিশাখাকেও ঘৃণা করতে হবে?

—বিশাখার উচিত এখন কিছুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকা!

—বিশাখাকে তুমি চেন না? অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে সে অন্য কোথাও যাবে না।

—তুমি বিশাখাকে কি রকম দেখলে বলো। মন-মরা হয়ে আছে?

—ঠিক তার উল্টো। বিশাখা দারুণ হাসি-খুশি, সব সময় হাল্কাভাবে কথা বলছে। কিন্তু এটাই অস্বাভাবিক নয় কি? আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, বিশাখা ভেতরে ভেতরে দারুণ বিষণ্ন হয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে দারুণ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমার এত কষ্ট হচ্ছিল।

—আমি কি করতে পারি বলো। আমি দেবনাথকে বাঁচাতে পারবো না। বাঁচাবার ক্ষমতা থাকলেও সে চেষ্টা করতুম কিনা সন্দেহ।

—কিন্তু বিশাখা তোমার কথা বলছিল হয়তো তোমাকে দেখলে

সে একটু সান্ত্বনা পাবে। ও ভাবছে, সবাই ওকে পরিত্যাগ করতে চায়!

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে মনুজেশ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। এত সহজে তার নেশা হবার কথা নয়, কিন্তু তার চোখে একটা চকচকে জলের পর্দা। আমার চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না, যেন আমার ভেতর পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করছে। কিংবা তাও নয়, হয়তো আমার দিকে তাকিয়েও আমাকে দেখছেই না। মানুষের মন হঠাৎ নরম হয়ে গেলে, এই রকম দৃষ্টি হয়!

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মনুজেশ বললো, না, বিশাখার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—চলো, এবার ওঠা যাক।

—না, আর একটু বসো। আমি আর একটা বিয়ার নেবো। তুমি তা হলে কিছু খাবে না?

—না। তুমি তা হলে একা বসো। আমি এবার উঠি।

—আঃ, একটু বসো না! বিশাখার কথা বলে এমন মন খারাপ করিয়ে দিলে! বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না কেন জানো! আমার ভয় হয় ওকে দেখলে আমি বোধ হয় নিজেকে সামলাতে পারবো না। তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি, এরপর তিনচারজন মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছি, বুকে জড়িয়ে ধরেছি, তবু আমার বুকটা ফাঁকা রয়ে গেছে। মনে হয় বিশাখাকে না পেলে আমার বুকের ঐ শূন্যতা কিছুতেই ভরবে না। আর তো কোনো মেয়ের আঙুল ছুঁয়ে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাইনি!

মনুজেশ আরও কিছু বলতে লাগলো উচ্ছ্বাসের কথা। সেসব আর আমার কানে ঢুকলো না, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। নিজের ভেতরটা যাচাই করতে লাগলাম তন্ন তন্ন করে। আমার কি রাগ হচ্ছে মনুজেশের কথা শুনে? আমার অভিমানে কি ঘা লাগছে? বিশাখা সম্পর্কে শারীরিক ভাষায় প্রেমের কথা

শোনাচ্ছে মনুজেশ, এতে কি আমার আহত হবার কথা? কিন্তু আমার মনটা তো হাল্কাই লাগছে।

আমি হাল্কাভাবেই হেসে বললুম, কোনো মেয়ে সম্পর্কে আমার যদি ওরকম ফিক্সেশন থাকতো, আমি কিছুতেই ন্যাকা প্রেমিকদের মতন সে মেয়ের থেকে দূরে সরে থাকতাম না।

মনুজেশের বোধহয় আঁতে একটু ঘা লাগলো। রীতিমতন চটে উঠে বললো, দ্যাখো, আমি রীতিমতন ভদ্দরলোক! আমি ফেয়ার গেম-এ বিশ্বাস করি। এক সময় দেবনাথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আমি হেরে গিয়েছিলাম। এখন দেবনাথ বিপদে পড়েছে বলেই আমি তার সুযোগ নেবো—আমি সে রকম মানুষ নই।

—দ্যাখো মনুজেশ, তোমার মনটা বড় অপরিচ্ছন্ন! সুযোগ নেবার কথা উঠছে কোত্থেকে? বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু দেখা করে না, বিপদের সময়? বিশাখা এক সময় তোমার বন্ধু ছিল—

—কিন্তু ভাই এখন অভ্যেসটাই এমন হয়ে গেছে, শরীর ছাড়া অন্য কোনো রকম সম্পর্ক ভাবা একটু কষ্টকর মেয়েদের সম্পর্কে। এখন কি আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু মুখোমুখি বসে গল্প করার দিন আছে? শুনেছি পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে গেলে আবার মানুষ ওতে আনন্দ পায়।

—মনুজেশ আমি এবার উঠবো!

—আরে বোসো না! নিজেই ডেকে আনলে! তুমি তাহলে বলছো, বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে?

—আমি কিছুই বলছি না। সেদিন বিশাখার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, ও তোমার কথা এখনো ভাবে।

—কিন্তু দেবনাথ যে আমাকে একদম পছন্দ করে না! বিয়ের পর দু'তিনবার গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে, দেবনাথ এমনভাবে তাকাতো—

—দেবনাথের তাকানো গ্রাহ্য না করলেই হয়। মুখে কিছু

বলার সাহস আর দেবনাথের নেই! আমি তো যাই, আমাকে তো কিছু বলে না। আমিও তো বিশাখার বন্ধু ছিলাম।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো? বিশাখা সম্পর্কে তোমার একটুও দুর্বলতা নেই?

রেস্তোরাঁর দেয়াল-জোড়া আয়নাতেই তো দেখতে পাচ্ছি, আমার মুখের একটা রেখাও বদলালো না। মনুজেশের হাত চাপড়ে বললাম, নাঃ, সেদিকে তোমার কোনো ভয় নেই। আমার সে রকম কিছু নেই বিশাখা সম্পর্কে।

—কেন নেই?

—এক সময় একটু আধটু ছিল হয়তো। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসি, দু'এক মাসের মধ্যেই তাকে বিয়ে করবো!

—তাই নাকি! কে মেয়েটি, আমরা চিনি?

সেসব কথা পরে হবে! চলো, এবার ওঠা যাক। আমাকে অফিসে ফিরতে হবে!

বাইরে বেরিয়ে আসার পর মনুজেশ বললো, তুমি বিশাখার কথা এমনভাবে মনে করিয়ে দিলে, না গিয়ে আর উপায় নেই। কিন্তু যদি মাথার ঠিক রাখতে না পারি!

আমি ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, যদি চাও তো আমি দেবনাথকে সন্ধ্যের পর বাইরে ডেকে এনে তোমায় সুযোগ করে দিতে পারি!

—মনুজেশ সান্যাল ওসব সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে না! মনুজেশকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা আবার আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসতে লাগলো। বেশ তেষ্টাও পাচ্ছে। অফিসে আজ না ফিরলেও খুব ক্ষতি হবে না। আমি আস্তে আস্তে আবার রেস্তোরাঁটায় ফিরে এসে এক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলাম। এসব আমি কদাচিৎ খাই। কিন্তু আজ,

সিনেমার ভিলেনদের মতন, আমাকে সামনে মদের গেলাস নিয়ে বসতেই হবে।

আমি বিশাখার কাছে কথা রাখতে পারবো না। তাই পরিকল্পনা করে মনুজেশকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার সাহস নেই, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার মতন মনের জোর পাচ্ছি না। বান্ধবীর স্বামী যদি ঘুষখোর হয়, তবে কিভাবে তাকে সাহায্য করা উচিত একথা আমাকে কেউ বলে দিতে পারে না।

বিশাখা সত্য জানতে চেয়েছিল। কি হবে সত্য জেনে? দেবনাথ যদি সত্যিই ঘুষখোর হয়, তাহলে কি বিশাখার উচিত স্বামীকে ত্যাগ করা? সমাজের নির্দেশ কি তাই? দেবনাথের তো বিচারে ফাঁসী হবে না, বড়জোর দু'তিন বছরের জেল হতে পারে। জেল থেকে সে ফিরে আসবেই—তারপরও সারাজীবন লোকে তার অপরাধের কথা ভুলবে না। আর বিশাখা সেই গ্লানির বোঝা বইবে?

আর বিশাখা যদি দেবনাথকে ছাড়তেও চায়, তার তো আর কোনো আশ্রয় দরকার। কে সে আশ্রয় দেবে? আমি নই! বিশাখার বিয়ের সময় আমারও মন কেমন করেছিল, কিন্তু একজন ঘুষখোর সরকারী অফিসারের ডিভোর্স করা বউয়ের সঙ্গে আর একজন সরকারী অফিসারের সম্পর্ক থাকা ভালো না! সেটা তার চাকরির সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর। আঃ, চাকরি, চাকরি! ভালোবাসা-টালোবাসার চেয়েও চাকরি অনেক বড়।

আমরা সবাই কিছু না কিছু অসৎ, কেউ সমাজের কাছে, কেউ হৃদয়ের কাছে। দেখেছি তো অনেকেই কিছু না কিছু কথা রাখে না। সবচেয়ে ভালো হয় বিশাখাও যদি একটু অসৎ হয়। মনুজেশের সঙ্গে সেও যদি অন্যায় কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে, তারও কিছু গোপন করার মতন ব্যাপার থাকে—তবে সেও আর দেবনাথের অন্যায়টাকে বড় করে দেখবে না। তাই তো নিয়ম। মনুজেশ পারবে না?

বছর পাঁচ সাড়ে পাঁচ আগে, বিশাখার সঙ্গে আমি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসটার পিছন দিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভেতরে একটা মস্ত বড় পুকুর—তখন বিকেল শেষ হয়ে গেছে, ভালো করে সন্ধ্যে নামে নি, আকাশটা অনেক নিচু হয়ে নেমে এসেছিলো মন্থর আলোয়—একটা সাদা হাঁস পুকুরটার জল দু'ভাগ করে এগিয়ে আসছিলো আমাদের দিকে। বিশাখা সেই দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ভারী সুন্দর, না? সে সুন্দর কথাটা উচ্চারণ করার জন্যই, সেই দৃশ্যটা সব সময় আমার চোখে ভাসে। স্মৃতিতে সেদিনকার সেই বিকেলের আকাশে কখনও সন্ধ্যে হয় নি। আজ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আমার মনে হলো, আজ এইমাত্র আমি কি যেন একটা বহুমূল্য জিনিস হারালাম। আমার বুকের মধ্যে দারুণ ব্যথা করতে লাগলো। সবাই ঠিক সময় ভালোবাসার কথা বোঝে না। সেদিন বুঝিনি, এতগুলো বছরেও বুঝিনি, আজ, মনুজেশকে বিদায় দেবার পর আমি বুঝতে পারলাম। আমি শুধু বিশাখাকেই ভালোবাসি। কিন্তু আমি বিশাখাকে চাই না।

—বিশাখা আমাকে জোর করে পাঠালো। আমি আসতে চাইনি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো যাবো করেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আমি খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই দিল্লী যাচ্ছি।

—তোমাকে দিল্লী যেতে হবে না।

অস্বস্তিকর অবস্থা। বিকেলবেলা অফিস থেকে বেরিয়েই দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দেবনাথ। আমাদের জয়েন্ট ডাইরেক্টর আমাকে তাঁর গাড়িতে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত লিফট দেবেন বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলাম। দেবনাথকে দেখেই আমি না দেখার ভান করেছি। বলা তো যায় না, দেবনাথের সঙ্গে যদি জয়েন্ট ডাইরেক্টরের কোনোক্রমে মুখ চেনা থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ওর ব্যাপার সব জানেন। কিন্তু দেবনাথই হাত তুলে

আমাকে ডাকলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে মনোস্থির করে জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে বললাম, স্যার, আমি একটা লাল ফ্ল্যাগ দেওয়া ফাইল টাইপ করতে দিয়ে এসেছিলাম, সেটা সই করে আসিনি। আমি আর একটু অফিসে থাকবো, আপনি চলে যান বরং!

জয়েন্ট ডাইরেক্টর সরু চোখে একবার দেবনাথকে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, তাড়াতাড়ি সেরে নিও। ইয়ংম্যানদের ছুটির পর বেশীক্ষণ অফিসে থাকা ভালো না, ওতে স্বাস্থ্য টেঁকে না।

এই সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই দেবনাথ আর একটু রোগা হয়েছে। চোখ দুটোর তলায় ঘন কালো দাগ, দৃষ্টি জ্বলজ্বলে। এক মুহূর্তের জন্য যে দেবনাথের ওপর আমার একটু মায়া হলো না, তা নয়! কেন দেবনাথের এই অবস্থা হল? বিশাখার মতন একটি রূপসী মেয়েকে বিয়ে করে ওর কি সুখী হবার অধিকার ছিল না? নিছক বুদ্ধিভ্রমে ওর এই দশা?

প্রথমে আমি ওকে বলতে উদ্যত হয়েছিলাম। কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে? অফিসের ভেতরে এলেই পারতে? —কিন্তু বলিনি, নিজেকে সামলে নিয়েছি ঠিক সময়ে। সর্বনাশের ব্যাপার হতো তাহলে, সি বি আই-এর রিপোর্টে যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সে এসেছে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, একথা কেউ না কেউ কি আর জয়েন্ট ডাইরেক্টরের কানে তুলতো না! কান ভারী করার লোকের কি অভাব আছে? আমাকে যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে ডেপুটি সেক্রেটারি করে পাঠাবার কথা হচ্ছে, সেটা তাহলে পিছিয়ে যেত না? অথচ দেবনাথ গেলে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম কি? হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বসিয়ে চা খাওয়াতে হতো না। দেবনাথ যে আমার অফিসে ঢোকেনি, এজন্য সে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেই বলা যায়। সুতরাং তার সঙ্গে হাসি মুখেই কথা বলতে হলো।

দেবনাথ কিন্তু আজ আর তেমন নির্জীব নিরুৎসাহ নয়।

কোথা থেকে সে যেন একটা নতুন শক্তি পেয়ে গেছে। রীতিমতন জোর দিয়ে সে বললো, তোমাকে আর দিল্লী যেতে হবে না!

আমি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন!

—এই শুক্কুরবার আমার মামলার তারিখ পড়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এবার আমি তাড়াতাড়ি মামলা চুকিয়ে ফেলতে চাই। আমি কি করবো, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

আমি রীতিমতন ভয় পেয়ে গেলাম। সাত আট মাসের মধ্যে দেবনাথের সঙ্গে আমার ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে, কখনো তাকে এমন পরিষ্কার তেজের সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি।

—কি ঠিক করে ফেলেছো?

—আমি আমার উকিল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি জজের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে বলবো, আমি সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছি! আমি দোষ স্বীকার করছি।

—কি বলছো কি! তুমি পাগল হয়ে গেছো!

দেবনাথ হাসলো। কি কঠিন ঠাণ্ডা সেই হাসি। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, তুমি বিশ্বাস করো, আমি নিরপরাধ।

—ইয়ে, মানে, আমার বিশ্বাস করা-না-করায় কি আসে যায়? তোমার যদি সত্যি দোষ না থাকে, আইনের কাছে তুমি নিশ্চয়ই তা হলে ছাড়া পাবে। অ্যাকুইট্যাল হয়ে গেলে তুমি চাকরি তো ফিরে পাবেই, সাসপেনসান পিরিয়াডের সমস্ত মাইনে ফেরৎ পাবে।

—আইন আমাকে বাঁচাবে? আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, আমি পেছন ফিরলেই সবাই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে চোর বলে, এমন কি আমার স্ত্রীও আমায় বিশ্বাস করেনি।

—না, না, বিশাখা মোটেও সে রকম ভাবে না।

—আশা করি আমার স্ত্রীকে আমার চেয়ে তুমি বেশী চেনো না!

এবার আমার প্রস্তুত হবার পালা। আমি সতর্ক ভঙ্গিতে বললাম, ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে এসেছো কেন আজ ?

হাঁটতে হাঁটতে আমরা লাল দিঘি পেরিয়ে রাজভবনের পাশ দিয়ে চলেছি। রাস্তায় আর কেউ যাতে শুনতে না পায় এই রকম ভাবে ফিসফিসিয়ে দেবনাথ আমাকে বললো, বিশাখা আমাকে জোর করে পাঠালো। তুমি ওর কাছে কি যেন কথা দিয়ে এসেছিলে, সেটা ভুলে গেছ কিনা জানতে। বিশাখা তোমাকে দু'দিন অফিসে ফোন করেছিল, পায়নি। একদিন তোমার অফিস থেকে বলেছে তুমি লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরো নি—আর একদিন তুমি অন্য কোন্ অফিসারের ঘরে ছিলে—সেখান থেকে তোমাকে ডেকে দেওয়া যাবে না। ওর ধারণা হয়েছে, তুমি বোধ হয় যে-কথা দিয়েছিলে, সেটা রাখতে চাইছো না।

—বিশাখাকে আমি কি কথা দিয়েছিলাম তুমি জানো না ?

—জানি। তাই তো তোমাকে বারণ করতে এলাম। আমার আর কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্যের দরকার নেই। আমি আইনের কাছ থেকেও সুবিচার চাই না। আমি সব দোষ স্বীকার করবো!

—তুমি সত্যিই ওসব করেছিলে ?

—তোমার জেনে কি লাভ ?

নেতাজী মূর্তির কাছাকাছি এসে, রাস্তা পার হবার জন্য আমরা থমকে দাঁড়িয়েছি। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিকটায় ডুবে যাচ্ছে সূর্য। আমার হঠাৎ মনে হল দেবনাথ আমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক খেলা খেলছে। জামার হাতা থেকে ও এখনো সব তাস বার করেনি—। আমাকে জানতেই হবে, দেবনাথ সত্যিই ঐ সব অপরাধ করেছিল কি না!

দেবনাথের হাত চেপে ধরে আমি খুব মিনতি করে বললাম, দেবনাথ, কেন এরকম হচ্ছে সব কিছু ? বিশ্বাস করো, আমি

তোমার বন্ধু। আমাকে তুমি সত্যি কথাটা বলো, আমার দ্বারা যদি কিছুমাত্র সাহায্য করা সম্ভব হয়—

আমি যে মিথ্যে বলেছি, তা সেই মুহূর্তে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। একথা ঠিক, দেবনাথকে কোনোরকমে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সেই মিথ্যে বলার সময়েও আমার গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া লেগেছিল।

দেবনাথ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, আমি ঐ সব অন্যায়গুলো করেছি। করেছি, কারণ ঐগুলো করাই সহজ ছিল। আমি যে পোস্টে কাজ করতাম, সেই পোস্টে অন্যায় না করাই শক্ত। কিছুদিন চাকরি করার পর আমি জানতে পারলাম, আমার বাবাও ঘুষ নিতেন। আমাদের ভবানীপুরের বাড়িটা ঘুষের টাকায় তৈরী।

—দেবনাথ!

—শুনতে তোমার খারাপ লাগছে তো! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমার বাবাও ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। বৃটিশ আমলে আরও সহজ ছিল। যাক গে, তুমি এখন কোন্ দিকে যাবে?

আমি কোন দিকে যাবো, তা তো আমি নিজেই জানি না। বিশাখার মুখটা চকিতে একবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বিশাখা সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছিল কেন? মুনি ঋষিরা যে কারণে সত্যের সন্ধান পেতে চায়, সেই জন্য? না সামাজিক অপবাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

আমি বললাম, দেবনাথ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি কিছু একটা চালাকি করতে চাইছো।

রেড রোডের ওপর দাঁড়িয়ে দেবনাথ হাসতে লাগলো। তার মুখে এরকম হাসি আমি কখনো শুনিনি। দেবনাথ ফিরে পাচ্ছে তার আগেকার চেহারা, আগেকার প্রাণোচ্ছলতা। অথচ এখন তো তার এসব ফিরে পাবার কথা নয়।

—আমাদের বাড়ি যাবে নাকি ? বিশাখার সঙ্গে দেখা করে আসবে !

—তুমি ওকে বলেছো যে, তুমি আদালতে সব স্বীকার করতে যাচ্ছো ?

—না, ওকে এখনো বলিনি। আজ সকালবেলাই ঠিক করলাম। সেই থেকে আমার মনের ভাব কেটে গেছে। অন্যায় করার মতন অন্যায় স্বীকার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও অনেক দেরী লাগে। অফিসে প্রথম দু'তিন বছর আমিও ভদ্রলোক ছিলাম, কড়া অফিসার হিসেবে আমার নাম ছিল—তারপর আমাকে মাদ্রাজে ট্রান্সফার করার কথা উঠলো, আমি তখনও কারণটা বুঝতে পারিনি।—একদিন একজন বুড়ো কেরানী আমাকে আমার বাবা সম্পর্কে ইঙ্গিত করলো, সে আমার বাবার সঙ্গে বাঙ্গালোরেও চাকরি করেছিল !

—আমি এসব শুনতে চাই না।

—সত্যি তো, তোমাকে এসব শোনাবার কি-ই বা মানে হয়। চলো, আমাদের বাড়িতে চলো, বিশাখার সঙ্গে দেখা করে যাবে। বিশাখার শরীরটা ভালো নেই দু'দিন থেকে।

—কেন, কি হয়েছে ওর।

দেবনাথ আবার হাসতে আরম্ভ করলো। স্ত্রীর অসুখের কথায় হাসির কি আছে ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ছেলেটার ? অথচ আজই এতদিন বাদে দেবনাথের কথাবার্তা সব সুস্থ ধরনের। তবে আবছা অন্ধকারময় রেড রোডে দাঁড়িয়ে নিজের কোন রসিকতায় এমন প্রশান্তভাবে হাসছে ও ? ঘুষখোরের ছেলে ঘুষখোর, তার আবার এত আনন্দ কিসের ?

আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কেন এই জটিলতার মধ্যে আমাকে জড়ানো ! ইচ্ছে হলো, দেবনাথের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। আমার তো এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের

কাপ নিয়ে বসার কথা। রেকর্ড প্লেয়ারে চড়ানো থাকবে সেতারের লং প্লেয়িং। বছর দু'এক আগে জয়াকে যদি বিয়ে করতাম তাহলে দৃশ্যটা কমপ্লিট হতো। এইসবের জন্যই তো চাকরি!

রীতিমতন ধমক দিয়ে বললাম, হাসছো কেন? কি হয়েছে বিশাখার?

—হাসবো না? আজ আমার বড় আনন্দের দিন হে! শোনো, বিশাখাকে আমি সব সময় খুব যত্নে রেখেছি। বড় ভালো মেয়ে! নিজের স্ত্রী বলে বলছি না, তুমিও তো জানো! ওকে কখনো কোনো কষ্ট দিইনি। বিশাখা আমাকে ভালোবাসে না জানি, তবুও কোনো কষ্ট দিইনি।

দেবনাথ আমার দিকে উৎসুকভাবে তাকালো। আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। ওদের দাম্পত্য ব্যাপার, এতে আমার বলার কি আছে!

দেবনাথ আবার বললো, বিশাখা অবশ্য চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু পারেনি। ও তো আবার তোমাকেই ভালোবাসে কিনা—

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, কি বলছো কি যা তা! বিশাখা আমার ছোটবোনের মতন।

সংকটের সময় মানুষ আপনা আপনি কি রকম মিথ্যে কথা বলে! বিশাখা সম্পর্কে আমার আর যা-ই মনোভাব হোক, আমি ওকে কোনোদিন ছোটবোন হিসেবে মোটেই দেখিনি। সেটা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু দেবনাথের ঠাণ্ডা গলায় ঐ কথা শুনে আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আবার জোরের সঙ্গে বললাম, বিশাখা আমার ছোটবোনের বন্ধু ছিল, আমারও ছোট বোনের মতন—

—আহা-হা, তোমাকে তো কোনো দোষ দিচ্ছি না। আমার বউ যদি মনে মনে তোমাকে ভালোবাসে, সেটা কি তোমার দোষ? তুমি যে ব্যাপারটাকে কখনো গুরুত্ব দাওনি, তা তো আমি জানিই! বিশাখাকেও দোষ দিতে পারি না। ওরকম মনে মনে খানিকটা

ভালোবাসা প্রায় সব মেয়েরই থাকে অন্য কারুর জন্য। ধরো, তোমার সঙ্গেই যদি বিশাখার বিয়ে হতো, তা হলে তখন বোধ হয় আমার প্রতি ওর একটু একটু ভালোবাসা থাকতো!

—দেবনাথ, এ সব আজেবাজে কথা শোনার সময় নেই আমার!

—আরে শোনোই না, সবচেয়ে মজার কথা কি জানো, যেদিন থেকে আমি সাসপেন্ড হলাম, তারপর থেকেই কিন্তু বিশাখা আমাকে খুব ভালোবাসতে লাগলো। কি এর রহস্য জানি না, কিন্তু বিশাখা প্রাণপণে চেষ্টা করতো আমার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। হয়তো তার একটা কারণ এই, বিশাখা গোড়া থেকেই আমার নামে সব অভিযোগগুলো বিশ্বাস করে ফেলেছিল। আর প্রমাণহীন সেই বিশ্বাসের জন্যই অনুশোচনা হয়েছিল ওর—

—দেবনাথ, তুমি কখনো রেস খেলতে?

—রেস? জীবনে একদিনও খেলিনি। হঠাৎ একথা তোমার মনে হলো কেন?

—টাকাগুলো কি করলে তবে?

—কিসের টাকা? আমার সব টাকা আমি স্টেট ব্যাঙ্কের পাটনা ব্রাঞ্চে বিশাখার নামে জমা করে দিয়েছি। তাতে আর কেউ হাত ছোঁয়াতে পারবে না!

টাকাগুলো যে নষ্ট হয়নি, একথা শুনে আমার একটা নিশ্চিত নিঃশ্বাস পড়লো কেন? মনুজেশ মিথ্যে কথা বলেছে! কিন্তু ঐ পাপের টাকা তো নষ্ট হওয়াই উচিত ছিল। তবু, টাকা জিনিসটা এমন, কোথাও সেটা আছে—এটা জানলেই ভাল লাগে! ঘেন্নায় শিউরে ওঠা উচিত ছিল না আমার!

—প্রায় তিয়াত্তর হাজার টাকা জমা রেখেছি বিশাখার নামে। সে টাকা আর আমারও তোলার ক্ষমতা নেই। তোমার কি ধারণা, বিশাখা সে টাকা কখনো ব্যবহার করবে না? আমার টাকা বলে বিলিয়ে দেবে? মেয়েরা তা পারে?

দেবনাথের মাথায় কি ভূত চেপেছে? কিছু একটা শয়তানি পরিকল্পনা নিয়ে সে খেলা করছে। কিন্তু আমি কেন তার মধ্যে! আমার মুক্তি চাই। আমি কাতরভাবে বললাম, দেবনাথ, আমি এবার বাড়ি যাবো।

—আসল কথাটাই এখনো তোমাকে বলা হয়নি। দিন দু' এক ধরে বিশাখার খুব বমি হচ্ছিল। কাল ডাক্তার এসে বললো, ইউরিন, টেস্টও হয়ে গেছে—বিশাখার ছেলেমেয়ে হবে। সাড়ে তিন মাস চলছে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। কনফার্মড্! এ কথা জানার পরই আমি ঠিক করলাম—কোর্টে গিয়ে সব স্বীকার করবো।

—দেবনাথ! এ কথার মানে কি?

—বুঝতে পারলে না? আমার বাবা আমার কাছে কিছু স্বীকার করে যাননি। কিন্তু আমার ছেলে বা মেয়ে যাই হোক—সে অন্তত বুঝতে পারবে, তার বাবা যাই করে থাকুক—সত্যি কথা বলেছিল।

—সত্যি কথা বললেই কি সবকিছু মিটে যায়? একথা স্বীকার করলে তোমার জেল হবেই। তুমি বিশাখাকে এই অবস্থায় ফেলে জেলে যাবে? তোমার সন্তান যখন জন্মাবে—

- তা হলে আমি কি করবো?

—তুমি কেস চালিয়ে যাও! বিচারে যদি ছাড়া পাও, তবে শুধু শুধু তুমি জেল খাটতে যাবে কেন?

দেবনাথ আবার হাসলো। বললো, আমি ঐ দোষগুলো করেছি জেনেও তুমি আমাকে কেস কনটেস্ট করার পরামর্শ দিচ্ছো? তুমি বলছো, অপরাধ করেও আমার শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?

দেবনাথ এমনভাবে প্রশ্নটা রাখলো যে, আমি প্রায় 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। আমি নিজে একজন বিবেকবান নাগরিক

হয়ে কি করে একজন অপরাধীকে প্রশ্রয় দেবো ? কিন্তু দেবনাথের সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা চক্রান্ত, সে কি এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে চায় বিশাখার বিরুদ্ধে। গর্ভবতী অবস্থায় বিশাখাকে ফেলে গিয়ে সে হাসতে হাসতে জেলে যেতে চাইছে। বাপের বাড়িতে গিয়ে পর্যন্ত বিশাখা মুখ দেখাতে পারবে না। হাসপাতালে সবাই জানবে, নবজাতকের পিতা একজন জেলের কয়েদী।

আমি তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, এ কথা তুমি বিশাখাকে এখনও বলোনি ?

একটা উদাসীন নিঃশ্বাস ফেলে দেবনাথ বললো, বিশাখাকে আর বলে কি হবে। তার শরীর এখন ভাল না। তোমার কি ধারণা, জানলেও বিশাখা আমাকে আটকাবে ?

—তুমি নিজের অপরাধের বোঝা বিশাখার ওপরেও চাপিয়ে দিতে চাইছো কেন ?

—আমি বিশাখাকে খুব যত্নে রেখেছি এতদিন। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় তাকে নিয়ে গেছি রাণীক্ষেত কিংবা উটকামণ্ড কিংবা ডালহৌসি। এখন আমার বিপদের সময় সে অংশ নেবে না ? নিশ্চয়ই নেবে—বিশাখা সেই রকমই মেয়ে।

—চলো, আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—যাবে ? আমি জানতাম তুমি যাবে। আগে রাজী হলেই পারতে। তাহলে এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হতো না। বিশাখার সামনে গিয়ে তো এইসব কথাগুলোই আবার বলতে হবে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে উঠে বসলাম। আর একটাও কথা বললাম না ওর সঙ্গে। দেবনাথের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই দেখলাম মনুজেশ ঐ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমাদের দেখেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললো, সুনীল, ট্যাক্সিটা ছেড়ো না। ইয়ে, দেবনাথ-বাবু, আপনি ওপরে যান। বিশাখা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আমি আর সুনীল গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনি—

দেবনাথ বিনা উত্তেজনায় মৃদু হাস্যে বললো, আপনাদের যেতে হবে না। আপনারাও ওপরে আসুন। আমি টেলিফোনে আমাদের চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনছি!

বসবার ঘরেই সোফার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিশাখা। পা দুটো গোটানো, কিন্তু একটা হাত ঝুলছে, কাঁপছে একটু একটু। একজন দাসী তার মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছে, ভিজে গেছে কার্পেট। দেবনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে, ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বললো, চিন্তার কিছু নেই। ওর এরকম আগেও দু-একবার হয়েছে। আপনারা বসুন।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেবনাথ পুরনো কালের সবুজ-রঙা স্মেলিং সল্টের শিশি বার বরলো। বিশাখার নাকের কাছে সেটা ধরতেই একটু বাদে জ্ঞান ফিরে এল তার। চোখ মেলে আমাকে দেখেই বিশাখা ধড়মড় করে উঠে বসলো। উদভ্রান্তভাবে ঘরের সবার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালো একবার, মনুজেশের দিকে তার দৃষ্টি দু-এক মুহূর্ত থেমে রইলো। তারপর দাসীকে বললো, ঠিক আছে, সুরোর মা, তুমি এখন যাও!

বিশাখা আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো! প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, সুনীলদা, তুমি খবর নিয়েছিলে?

এক মুহূর্তও দ্বিধা করলাম না। আমি উৎফুল্ল ভাব এনে বললাম, মেসোমশায়ের সঙ্গে দু'দিন আমার ট্রাঙ্ককলে কথা হয়েছে।

—কি?

—ওর কোনো দোষ নেই। সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। খুব সম্ভবত অন্য লোকের সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার ফ্রেস তদন্ত হবে।

ঘাড় ফেরাতেই দেখি, দেবনাথ আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। বিশাখাও হাসলো স্বামীর দিকে চেয়ে। তারপর আবার

আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দু-এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে? মনুজেশদার মুখে শুনলাম! কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে?

বললেও বলতে পারতাম যে, মনুজেশক আমি ও কথা ঠাট্টা করে বলেছি। বিয়ে করার কথা আমার মনেই পড়ে না। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললাম, এখনো একেবারে ঠিক হয়নি। কথাবার্তা চলছে। না, মেয়েটিকে তুমি চেনো না।

ঘরের সবারই এখন হাসিমুখ। মানুষের হাসিমুখ দেখতে সত্যি খুব ভাল লাগে। এর জন্য দু-একটা ছোটখাট মিথ্যে বলায় কোনো দোষ নেই।

দেবনাথ আত্মহত্যা করার দেড় বছর পর মনুজেশ একদিন আমার বাড়িতে এলো। মনুজেশ অনেকটা বদলে গেছে, রীতি-মতন দায়িত্ববান গম্ভীর ধরনের মানুষ এখন। চিন্তিতভাবে বললো, সোমনাথ বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বিশাখার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে একেবারে।

বেশ কিছুদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। আমাকে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি করা হবে, না পুরুলিয়ার এ ডি এম করে পাঠানো হবে—এই নিয়ে টালবাহানা চলছিল। আমিই জোর-জার করে জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে ধরে চলে গিয়েছিলাম পুরুলিয়া। বেশ শান্তিতে ছিলাম। ছুটিতে মাত্র দশ দিনের জন্য এসেছি, মনুজেশ কি করে খোঁজ পেয়ে গেছে।

যে-শুক্রবার মামলার ডেট ছিল দেবনাথের, তার আগের দিন রাত্তিরে সে আত্মহত্যা করে। আজও আমি দেবনাথের আত্মহত্যার কারণটা ঠিক মতন বুঝতে পারিনি। ও কি নিশ্চিত জানতোই যে ওর শাস্তি হবেই—তাই তার হাত এড়িয়ে গেল? অথবা, নিজের সন্তানকে—জেলখাটা কয়েদীর সন্তান—এই অপবাদ থেকে মুক্তি

দিয়ে গেল ? কিংবা, বিশাখার কাছে আমি বলেছিলাম, দেবনাথ নির্দোষ—সেটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যই ও মরে দেখিয়ে দিয়ে গেল ? দু-এক বছরের জেল খাটাই বা এমন আর কি। কি এমন অভিমান ছিল তার, যে-জন্য সে আর বাঁচতে চাইলো না ? নৈরাশ্য থেকে মরেনি দেবনাথ, সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেই সে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু দেবনাথের মৃত্যুর পর আমি আর বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমি কাপুরুষ।

মনুজেশের মুখেই শুনলাম, খুব সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হয়েছে বিশাখার। দেবনাথের ছোট ভাই সোমনাথ প্রথম কিছুদিন বেশ ভাল ব্যবহারই করেছিল ওর সঙ্গে। এখন আবার আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। অফিসে বোধ হয় ঘুষ নিতে পারে না সোমনাথ, কিন্তু টাকার লোভ তারও কম নেই। পাটনার ব্যাংকে বিশাখার নামে জমা দেওয়া একগাদা টাকার খোঁজ সে পেয়ে গেছে কি করে —এখন সে সেই টাকারও অংশ চায়। তার দাদা পৈতৃক সম্পত্তিই সরিয়ে রেখেছে বৌদির নামে—এই তাঁর অভিযোগ। নইলে বৌদি প্রকাশ্যে স্বীকার করছে যে ঐ টাকা ঘুষের টাকা!

মনুজেশ বললো, বিশাখা কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না। কিন্তু ও যতদিন না রাজী হয়, আমি ওর জন্য অপেক্ষা করতে চাই।

– কি ব্যাপারে ?

–আমি বিশাখাকে বিয়ে করতে চাই !

—বাঃ, ভাল কথাই তো। বিশাখার বাবাও তো মারা গেছেন, তাই না ?

—হ্যাঁ। ঐটুকু বাচ্চা নিয়ে ওর পক্ষে একা একা থাকা কি সম্ভব ?

—তা বিশাখা রাজী হচ্ছে না কেন ?

*—ঠিক অরাজী নয়, এক একবার রাজী হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে,* মনঃস্থির করতে পারছে না আর কি !

– ধরো, বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো। তা হলে তুমি ঐ পাটনা ব্যাঙ্কের টাকাটা নিয়ে কি করতে চাও ?

মনুজেশ মুখ কুঁচকে বললো, আমি ও টাকা ছুঁতেও চাই না। তবে, দেবনাথ মারা যাবার পর কেস ডিসমিস হয়ে যায়, আসল ব্যাপারটা আর জানা যায়নি। কিন্তু তুমিই তো বিশাখাকে বলেছিলে যে, তোমার মেসোমশায়ের কাছ থেকে জেনেছো, দেবনাথ নির্দোষ ছিল। তা হলে ও টাকাটাও নির্দোষ। ওটা বিশাখার ছেলেব জন্যই জমা রাখা উচিত। সোমনাথকে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, কলকাতায় আমি আর মাত্র দু'দিন থাকবো। এব মধ্যে আর ওদের ব্যাপারে জড়িয়ে পডার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোনো রকমে হালকাভাবে কথা বলে কাটিয়েও দিলেও হয়। মনুজেশটা দারুণ ভাবপ্রবণ দেখছি। একজন বদনামগ্রস্ত লোকের বাচ্চাসমেত বিধবাকে ও বিয়ে করতে চায়! প্যাচপেচে প্রেম বলে একেই। বুঝবে ঠ্যালা। আমার আব কি!

বললাম, তা বটে! সোমনাথের এটা অন্যায় দাবি! সে তো আর কচি ছেলেটি ছিল না যে তার ভাগের টাকা দেবনাথ ঠকিয়ে নেবে!

—তুমি বিশাখাকে একটু বুঝিয়ে বলবে ?

—কি ?

—এই ইয়ে, মানে ও যাতে সোমনাথের চাপে পড়ে কিছু ছেড়ে না দেয়! ও তো তোমাকে একেবারে দাদার মতন ভক্তি করে!

—আজকাল সব মেয়েরা নিজের দাদাকেও তেমন ভক্তি করে না।

—বিশাখা কিন্তু করে। তোমার কথা উঠলে—

—তুমি প্রায়ই যাও বুঝি ওর কাছে ?

—প্রায় রোজ। একা একা থাকে ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে—তা ছাড়া দেখো, বিশাখা ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—সেদিন, তুমি থাকতে থাকতেই বিশাখা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কেন?

—ও কথা থাক। ও কথা আর তুলো না!

—ঠিক আছে। কিন্তু দেবনাথের ছেলেকে তুমি নিজের ছেলের মতন মানুষ করতে পারবে?

—কেন পারবো না? শিশুদের ওপর কোনো দোষ লাগে না।

—দাঁড়াও, আমি পোশাকটা পাল্টে আসছি। আমিও তোমার সঙ্গে বেরুবো।

মনুজেশকে বসিয়ে ভেতরের ঘরে এলাম। কাচা সার্ট প্যান্ট রয়েছে, কিন্তু একটাও পরিষ্কার গেঞ্জি পাচ্ছি না। ঠিক দরকারের সময় যে এগুলো কোথায় যায়। চাকর-বাকর দিয়ে আর কাজ চলে না। নাঃ, এবার একটা বিয়ে করেই ফেলতে হবে। হোম সেক্রেটারি তাঁর ভাগ্নী সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিয়ে তো মানুষ শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকেই করে, হোম সেক্রেটারির ভাগ্নীই বা মন্দ কি! ওঁর এখনও রিটায়ার করতে তিন বছর দেরী আছে, এর মধ্যে বিয়ে করাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। একবার মফঃস্বলে গেলে আর সহজে কলকাতায় পোস্টিং হয় না—এখন ওরকম কারুর সুপারিশ ছাড়া কলকাতায় ফেরার আর আশা নেই। ভাবতে ভাবতে একটু হাসি পেল আমার। সামান্য চাকরিতে বদলির সুবিধের জন্য আমি বিয়ের কথা ভাবছি? কিন্তু এমন অস্বাভাবিকই বা কি, অনেকে তো টাকার জন্যও বিয়ে করে। ভালবাসার জন্য বিয়ে করে আর ক'জন, বিশেষত তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেলে—মনুজেশের মতন দু' একটি মূর্খ ছাড়া?

বিশাখাকে দেখে একেবারে চোখ ভরে যায়। এখন সত্যিই

একটু রোগা হয়েছে, কিন্তু মোমবাতির আলোর মতন রূপ। কোমল চোখ দুটিতে বিষন্নতার ছায়া। বাচ্চাটাও দারুণ সুন্দর হয়েছে, বছর খানেক বয়েস, দেবশিশুর মতন মুখশ্রী, দেয়াল ধরে ধরে টলমল করে হাঁটে, মুখভর্তি খলখলে হাসি। বিশাখা আর বাচ্চাটার মুখের দিকে পর পর তাকিয়ে, আমার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্‌ করে উঠলো। এ আর কিছু নয়, সুন্দর জিনিস দেখার বেদনা। মনুজেশ এই গোটা সুন্দর দৃশ্যটাই আয়ত্ত করতে চায়, বুঝতে পারলুম। আমার পক্ষে দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট। বেচারা দেবনাথ, ওর জন্যও মায়া হলো আমার, ও এই সুন্দর দৃশ্যটি একটুও ভোগ করতে পারলো না—চলে গেল কোথায় কোন অন্ধকারে।

খানিকটা অভিমান মেশানো গলায় বিশাখা বললো, কেমন আছো?

—ভাল আছি।

তারপরেই, মনুজেশকে চমকে দিয়ে আমি আবার বললাম, এবার কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি।

ফ্যাকাশেভাবে হেসে বিশাখা বললো, আমার কাছে? আমার কাছে কি চাইবে তুমি?

বিশাখার চোখে নিবিড় কৌতূহল। সেদিকে আমার দু চোখ নিবদ্ধ রেখে আমি বললাম, পুরুলিয়াতে সরকারী উদ্যোগে আমরা একটা উন্মাদ আশ্রম খুলছি। যে-সমস্ত পাগলকে তাড়িয়ে দেয় আত্মীয়স্বজনরা, যাদের কেউ দেখবার নেই—তাদের চিকিৎসার জন্য। টাকার জন্য কাজ আটকে আছে। জনসাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, অনেকে জমি কিংবা টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছে। তোমার তো পাটনার ব্যাঙ্কে অনেকগুলো টাকা আছে, তুমি তা এখানে দিয়ে দাও না!

মনুজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ওর ছেলের ভবিষ্যতের জন্য লাগবে না?

আমি মনুজেশের দিকে ফিরে বললুম, আজকালকার ছেলেদের জন্য বিষয় সম্পত্তি রাখতে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়ানোই ভাল। আর ওর লেখাপড়ার খরচ চালাবার উপায় নিশ্চয়ই আছে?

মনুজেশ এবারও সঙ্গে সঙ্গে বললো, তা আছে!

বিশাখার দিকে ফিরে, আবার তার চোখে চোখ রেখে বললুম, আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে দেবনাথের আত্মা নিশ্চয়ই এতে খুশীই হবে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে বিশাখা, বুঝতে ওর দেরী হলো না। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে বললো, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি। কার নামে চেক লিখতে হবে?

—লেখো, ডি এম অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, পুরুলিয়া মেণ্টাল হোম স্কিম।

মনুজেশ বললো, এক হিসেবে এই-ই ভাল হলো। ও টাকা সোমনাথকে দেবার কোনো মানে ছিল না।

ঘরের মধ্যে যেন একটা টাটকা তাজা হাওয়া খেলে গেল। বিশাখা লঘু পায়ে উঠে গেল চা করতে। আমি ওর ছেলেটাকে আদর করতে লাগলুম। পর্দার কাপড়ের রং না মিললে নিউ মার্কেটে ছুটতো বিশাখা, দুর্লভ পারফিউম সংগ্রহ করা ছিল ওর শখ—সেই বিশাখা এখন নির্মোহ হতে পেরেছে।

চা নিয়ে ফিরে এসে বিশাখা একটু হালকাভাবে বললো, শুধু এই চাইতে এসেছো? আর কিছু চাইবে না?

—হ্যাঁ, আর একটা আছে। এবার সত্যি সত্যি আমি বিয়ে করছি, মাস তিনেকের মধ্যে।

—কাকে? চেনাশুনো কেউ?

—না, আমাদের হোম সেক্রেটারির ভাগ্নী। মেয়েটি এম এ পাশ—সেই বিয়েতে তোমায় যেতে হবে। শুনেছি, এখনও তুমি বাড়ি থেকে বেরোও না···আমার বিয়েতে তোমাকে যেতেই হবে।

—যাবো, নিশ্চয়ই যাবো! আমার বিয়ের সময় তুমি পিঁড়ি

ধরেছিলে, মনে আছে ?

—আমার সব মনে আছে।

—সব ?

—হ্যাঁ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসের পেছন দিকের পুকুরে বসে সেই সাদা হাঁস দেখা পর্যন্ত।

—সেটা কবে বলো তো ?

—সেটা তোমার মনে নেই তো ? সেই দিনটাই আমার বেশী মনে আছে।

বিশাখার মুখটা একটু উদাস হয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে ছেলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

আমি বললাম, আমার বিয়ের আগে, আর একটা বিয়ের ঘটকালি করে যাবো নাকি ?

বিশাখা আর মনুজেশ পরস্পরের চোখের দিকে একবার তাকালো। তারপর বিশাখা শুকনো গলায় বললো, না, এখন না, আর কিছুদিন পরে।

মনুজেশও বললো, হ্যাঁ, আর কিছুদিন যাক।

আমি বললাম, মনুজেশ তুমি তা হলে বসো। আমি এবার উঠি। আমার একটা কাজ আছে।

সিঁড়ি পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এলো বিশাখা। সিঁড়ির রেলিং-এ আমার হাতের ওপর হাত রাখলো। আরও দুদিন এ রকম হাত রেখেছিল, ওর বিয়ের দিন, আর যেদিন দেবনাথ সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল। ওর হাতে সামান্য চাপ দিয়ে আমি নেমে এলাম।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার আগে আর একবার পেছন ফিরে দেখলাম, তখনও বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। চওড়া কালো পাড়ের শাড়ি পরা সেই অপরূপ মূর্তিকে আমি আর একবার দেখে নিলাম ভাল করে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মনে মনে বললাম, বিশাখা, তুমি আর আমাকে কখনো ডাকবে না, আর আমাকে তোমার প্রয়োজন হবে না। আমি তোমার কাছে একটা কথাও রাখিনি। একটাও মনের কথা বলিনি। কিন্তু বিশাখা, আমি তোমাকেই ভালবাসি। জীবনে দেরী করে যে ভালবাসার কথা বোঝা যায়, সে ভালবাসায় কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু সারা জীবনে তা আর ভোলাও যায় না।

অমন অকস্মাৎ ব্রেক কষায় আমার কপাল ঠুকে গেল। আমি বুঝতে পারলুম না লোকটা আত্মহত্যা করতে চায় কি না। ড্রাইভার কুশলী হাতে গাড়িটা থামিয়ে মুখ বাড়িয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে গালা-গালির ঝর্ণা বইয়ে দিল। লোকটা এগিয়ে এলো দরজার কাছে। রোগা, লম্বা, সারা ফর্সা মুখে ঘাম, ঝুঁকে নিচু হয়ে কি রকম যেন গলায় বলল, আমার উপায় ছিল না, উপায় ছিল না, আধ ঘণ্টা ধরে ট্যাক্সি খুঁজছি, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে হবে—দয়া করে—

আমি ও ট্যাক্সি ড্রাইভাব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম—কেন না লোকটার কথা বলার মধ্যে সাপ-খেলানো বাঁশীর সুর ছিল। লোকটার দুটো চোখ যেন একশোটা চোখ,আমার দিকে সর্বস্বভাবে তাকিয়ে আছে, লোকটা আবার আরম্ভ করে, আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে হবে, আমি আর পারছি না দাঁড়াতে, দয়া করে—। 'দয়া' কথাটা এমন ঘিনঘিনে এবং অস্বস্তিকর লাগে যে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্রব ছাড়তে ইচ্ছা হয়, আমি বলি, ঠিক আছে, আমি নেমে যাচ্ছি। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, সে বাঙালী ছিল—না, না আপনি বসুন, তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে, আপনারা কজন ?

লোকটা এ কথার কোন উত্তর না দিয়েই দবজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে বলে, একটু পাশের গলিতে একবার চলুন। আমি লোকটার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নাগরিক গাম্ভীর্য নিয়ে বসে থাকি। বাঁদিকে মোড় ঘরিয়ে বেশীদূর যেতে হয় না, একটা সাদা তিনতলা,একটাও গাড়ি-বারান্দা বা ব্যালকনি নেই,তাই বিশ্রী বাড়ির সামনে গাড়িটাকে থামান হলো। এক মিনিট, বলেই লোকটা দ্রুত ভিতরে চলে যায়, মনে হল বাড়িটা কোন প্রাইভেট ক্লিনিক, অনেক বড় সাইনবোর্ড এবং বহু ডিগ্রীধারী ডাক্তারের নাম।

আপনার শুধু শুধু দেরী হচ্ছে, ড্রাইভার আমাকে বলে, আপনার অসুবিধে থাকলে এখনো চলে যেতে পারি। থাক্, এই ধরনের একটা কথা আমি মুখে প্রকাশ করে তাকে ভঙ্গি দিয়ে বোঝাই।

সাদা পোশাকপরা দুজন লোক একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল, পিছনে সেই লোকটা ও একটি দুঃখিত চেহারার ডাক্তার। গাঢ় নীল রঙে রুপোলি তারা বসানো শাড়ি পরা মহিলাকে নিয়ে এল ওরা।

ততক্ষণে আমি উঠে এসে ড্রাইভারের পাশে বসেছি, আমি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম। সেই একবারই আমি দেখেছি ঐ মহিলার মুখ এ জীবনে,আর একবারও পিছনে ফিরে তাকাইনি, কিন্তু সেই মুখ গেঁথে গেল আমার দু'চোখের নরম জায়গায়, এক ঝলক দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছিলুম, একি দুর্ঘটনা আজ আমার, মনে মনে বললুম। আকাশের দিকে ফেরান সেই নিস্পন্দ মুখ ভোলা যায় না, ভুলতে পারিনি আমি। সেইজন্যই আজ একথা লিখছি, যদি সেই মুখের ছবি অন্য কারুকে দিয়ে আমি পেতে পারি বিস্মরণ।

ড্রাইভারটি নেমে দাঁড়িয়েছে, কোমরে হাত দিয়ে ব্যাপারটাকে শুঁকে দেবার মতো বলল, অজ্ঞান হয়ে গেছে ? একটা হাত ঝুলছে, তুলে দিন না !

বাহক দু'জনের অন্যতম জানাল, মর গিয়া।

— মরে গেছে ? এঃ—

লোকটি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করছে, ঐ রক্তটা বিক্রী হবে ? যখন দরকার ছিল, তখন কিনতে পারিনি, টাকা ছিল না। শেষ পর্যন্ত টাকা ধার করে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যখন কিনে আনলুম, তখন কাজে লাগল না।

—দেখি। সার্টিফিকেটটা রাখুন।

লোকটির সঙ্গে ড্রাইভারের বচসা লেগে গেল। না, না, এসব পারবো না···দয়া করুন, দয়া করুন, লোকটা আমার জানলার কাছে এসে হাত জোড় করে বলল, আপনি একটু দয়া করুন।

যতবার 'দয়া' শুনছিলুম, আমার শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। লোকটি বারবার একটি ড্রাইভার ও অপরিচিত একজনের কাছে দয়া চাইছে, ওকি স্ত্রীর মৃত্যুর আগের মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে দয়া চেয়েছিল? মনে হয় না, কারণ ওকে দেখলে মনে হয়, অতবড় আকাঙ্ক্ষা ওর নেই, নেই অতখানি সাহস। আমি চোখ বন্ধ করে কানে কুলুপ লাগিয়ে রইলুম।

একটু বাদে বুঝতে পারলুম, কোন একটা মিটমাট হয়েছে, মহিলার শরীর পিছনে শোয়ানো হল, দীর্ঘকায়া, স্বাস্থ্যবতী সেই প্রাণহীনা, স্বামী এক পাশে বসে মাথাটা তুলে নিল কোলের উপর। আমি চুপ করে বসেই রইলুম। আমার সামনে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একখানি মুখ, দু'একটা চুল উড়ে পড়েছে, খুব ফর্সা নয়, একটাও যন্ত্রণার রেখা নেই, প্রতিমার মতো স্ত্রী, কেউ চন্দন দেয়নি কপালে, চোখ দুটি অপলক খোলা, আর কোনদিন পলক পড়বে না একথা চোখে লেখা নেই।

ড্রাইভার বলল, অন্তত একটা অ্যাম্বুলেন্স তো ডাকতে পারতেন!

—এ কাজে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করেছিলুম। আমার মা অন্ধ, তিনি আসতে পারেন নি,—লোকটার গলার আওয়াজ বাষ্পময় কিন্তু অস্পষ্ট নয় - মা কান্নাকাটি করছেন, তাকে শেষ দেখা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

'অন্ধ মাকে শেষ দেখাতে' কথাটার মধ্যে খুবই সরলতা ছিল, কিন্তু কথাটার অর্থহীনতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল সে। আমার প্রধান দোষ, আমি মনে মনে কথা বলি,—নইলে লোকটির সঙ্গে যদি দু'একটা কথা বলতুম, যদি গলা ও জিভ দ্রুত কাঁপিয়ে

দু'একবার আহা, আহা ও দ্রুত ভারী নিঃশ্বাস ফেলা যেত, তাহলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারতুম, কিন্তু তার বদলে আমি মনে মনে ভেবে নিলুম ও বিষয়ে, খানিকটা যেন রহস্যের গন্ধও নাকে আসতে লাগল এবং যদি কোন রহস্য বা পাপ থাকে এই মৃত্যুতে —তাহলে আমি যে বিপদে পড়ব বা রমলার সঙ্গে আজ সন্ধেবেলা দেখা হবে না—এই রকম ছোট ছোট ভয় হতে লাগল।

তবু আমি কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি, মনে হল। কারণ যাই হোক, যে-কোন প্রশ্নই ঐ মহিলার মৃত্যুকে অপমান করবে।

মহিলা না মেয়েটি? যদি বিয়ে না হতো তবে অনায়াসেই ও একবার দেখা মুখটিকে বেণী দোলানো, বুকে ধরা বই ও খাতা, বাস-স্টপের যে কোন মেয়ের মতো ভাবা যেত—আঠেরো কি উনিশ। কিন্তু মৃত্যু ঐ মুখকে অনেক গভীর ও উদাসীন করেছে।

পকেটে হাত দিয়েও হঠাৎ আমার মনে হল সিগারেট খাওয়াটা অন্যায় এখন। লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারের কি যেন কথা হচ্ছিল আমি শুনিনি, গাড়ি তখন চলছিল, আমি বাইরের দিকে চেয়েছিলুম।

হঠাৎ একটা পাখির বাচ্চার মতো চি' চি' আওয়াজে আমি চমকে আর একটু হলে পিছন ফিরে তাকাতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলুম, কারণ আবার আমি ঐ মহিলার মুখ দেখতে চাইনি, যদিও মুখখানি গাড়ির উইন্ড স্ক্রিন জুড়ে ভাসছিল। লোকটির দু হাতে কতকগুলি জড়ো করা কাপড় ছিল, আমি আগে ভেবেছিলুম, স্ত্রীর পরিত্যক্ত ভূষনাদি, এবার বুঝলুম, একমাত্র পরিত্যক্ত ভূষণ, একটি শিশু।

তখনই মনে পড়ল, 'আপনারা ক'জন?'—ট্যাক্সিওয়ালার এই প্রশ্নে লোকটা কোন উত্তর দেয়নি, ক'জন ও জানে না, মৃত, সদ্যোজাত ও শোকার্ত,এই তিন মিলে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট বোধ হয় ভেবেছে। মৃত্যু নিয়ে কোন কথা বলতে পারিনি, ইচ্ছে হল,

প্রাণ নিয়ে কোন কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে। আমি মনে মনে একবার রিহার্সাল দিয়ে তারপর উচ্চারণ করলুম, বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। ওই হবে আপনার একমাত্র সান্ত্বনা।

ভদ্রলোক কোন উত্তর দিলেন না। হয়তো আমার কথাটা খুবই বোকার মতো অপ্রাসঙ্গিক হয়েছিল, অথবা এর আগে দশবার শুনেছে! কিছুক্ষণ চুপচাপ ও তার মধ্যে শিশুটির চি' চি' ও ট্যাঁ ট্যাঁ। কিন্তু একটু পরেই লোকটি যা বলল, তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। পিছন থেকে আমাকে ছুরি মারার মতো নৃশংস। —ও মরার আগে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, ভগবান, যদি আর একটা বছর অন্তত বাঁচতুম—

এ কথায় আমি হঠাৎ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলুম, আমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলা বন্ধ হয়ে এল, কপাল ও চোখের শিরা ফেটে কান্না আসতে লাগল। আমি দু'হাতে মাথা চেপে মুখ নিচু করলুম। এক বছর, মোটে এক বছর চেয়েছিল। কি হতো এক বছরে, কি ছিল ওর বাসনা? অন্তত আর এক বছর, ঐ কচি বউটি আর এক বছর চেয়েছিল! হয়তো কাপড় কিনে রেখেছে—জানলার পর্দা সেলাই করা হয়নি, বেলী ফুলের চারা লাগিয়েছিল—প্রথম ফুলটা দেখে যেতে পারল না—আর কি, এক বছরে আর কি কি, বাচ্চাটাকে এক বছরের স্তন্য, এক বছরের কান্না ও ভালোবাসা ঐ চিৎ করে শোয়ানো মুখটি চেয়েছিল। হয়তো চেয়েছিল আরও কয়েকবার উপুড় হতে ও পাশ ফিরতে। এক বছর, অন্তত এক বছর…

…আমার দইটা একটু ধরবেন, দইটা একটু ধরবেন, দইটা একটু ধরবেন, আমার…মফঃস্বলের শেষ বাসে ফিরছিলাম, আমি ভাগ্যবান উঠতে পেরেছিলাম ভিতরে…তারপরও কুড়ি কি পঁচিশ-জন লোক পা-দানির বাইরে শূন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, এক একটা ঝাঁকু-নিতে লোকগুলি কোথায় উঠছিল ও পড়ছিল জানি না, দরজার

তিন হাত বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আমার দইটা একটু ধরবেন, এক হাতে বড় মুস্কিল।

একটা হাত জানলা দিয়ে এগিয়ে এল, পাতলা কাগজে মোড়া একটা একপো দই-এর খুরি।

সাবধান, প্রাণটা বাঁচিয়ে—কে যেন বলল আমি খুরিটা ধরলুম।

দেখবেন প্রাণটা বাঁচিয়ে তারপর দই বাঁচাবেন, কে যেন বলল।

আমাদের আর প্রাণের দাম—দই-এর মালিকের উদাসীন গলা ভেসে আসে।

এর বদলে হেঁটে যান না—।

দশ মাইল দূরে বাড়ি, তাহলে আর ফিরতে হবে না।

এত ভিড় নিজের জায়গা নেই, তবু দই নিয়ে ওঠার শখ আছে, আর একজন বলল।

কোনরকমে বাড়ি ফিরে দই দিয়ে চারটি ভাত খাবো—বেঁচে থাকার সুখ এইটুকু—লোকটি আবার বলে।

আমি চুপ করেছিলুম। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিল বাসটা একবার। শব্দ নানা রকমের অদ্ভুত, খুবই চিৎকার মানুষের—একটু দূরে বাসটা থেমে যায়। শত শত কণ্ঠের বিউগল বাজিয়ে বহু লোক নেমে গেল—শুধু যারা বসার জায়গা পেয়েছিল তারা ছাড়া, আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম।

—শেষ হয়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে।

—একেবারে সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেথ।

—উঃ! দেখা যায় না, আমারও এরকম হতে পারতো।

—মার শালা ড্রাইভারকে!

—নিয়তি। একেবারে চাকার তলায় টেনে নিয়েছে।

আমি দই-এর ভাঁড়-হাতে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজেকে বিষম নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল। নেমে গিয়ে লোকটাকে দেখব এমন

সাহস নেই। দই দিয়ে মেখে চারটি ভাত খাবে বলেছিল লোকটা। বেঁচে থাকার সুখ।

—মাথার ঘিলু বেরিয়ে একেবারে দই হয়ে গেছে।

এমন অবসন্ন লাগল আমার। কিছু করার ছিল না, তবু নিজেকে মনে হতে লাগল চোর ও খুনী। আমি আস্তে আস্তে হাত থেকে ওর বেঁচে থাকার সুখটুকু মাটিতে নামিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, দশ মাইল দূরে ওর বাড়িতে ঢাকা-ভাতের থালার ওপর লোকটার বাসনা এখনো ঘুরছে।……

…বাচ্চাটার ট্যাঁ ট্যাঁ থামে না। এসে গেছি বলতেই ট্যাক্সি দাঁড়াল। বহু বুড়োবুড়ি ও পাড়ার ছেলে-ছোকরার ভিড় হয়। মহিলাকে শোয়ানো অবস্থাতেই নামানো হল হাঁটু ও কান না মুড়ে, আমি তখনও পিছন ফিরে তাকাইনি, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, লোকটি তখনও ট্যাক্সিতে বসে থাকে। ও নিজের শোকে অভিভূত, না আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারার ফল দেখছে বুঝতে পারি না। অন্তত আর এক বছর…আমি সহ্য করতে পারি না, আমার চোখ দপ দপ করতে থাকে। কে একজন মুখ বাড়িয়ে কি বলতেই লোকটা নেমে পড়ে—যাবার সময় আমার সঙ্গে ভদ্রতা করে যায়, আপনার কষ্ট হলো, কি বলে যে…। লোকটার উপর অসম্ভব রাগে আমার শরীর জ্বলে ওঠে, এমন ছদ্মবেশী শয়তান কখনো দেখিনি মনে হয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে লোকটা রাগ করতে পারছে না, কার জন্য, কার প্রতি অভিযোগ করবে। এই কি ওর ভদ্রতার সময়! ওর পক্ষে চরম ভদ্রতা হতো যদি ও হু-হু করে কাঁদত। চৌরঙ্গীতে ট্যাক্সি থামিয়ে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে কেঁদে উঠত, বলত, আমি যাকে ভালোবাসি তার মৃত্যু হয়েছে, সে আর একটা বছর বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ যাদের মৃত্যুবোধ নেই, যারা ভালোবাসায় ভুলে আছে তাদের বুকের মধ্যে কান্না ঢুকিয়ে দিত যদি। তার বদলে আমাকে একা—

—আপনি খুব ইয়ে হয়ে পড়েছেন স্যার,চলুন আপনাকে এবার পেঁছে দি, টালীগঞ্জ যাবেন তো ? ট্যাক্সীওয়ালা বলল, আপনাদের তো অভ্যেস নেই, আমরা কতরকম দেখছি। সয়ে গেছে। একদিন সারাদিন যদি ট্যাক্সীতে ঘুরতেন, দেখতেন কলকাতা এক আজব জায়গা আমাদের কতরকম এক্সপিরিয়েন্স হয় স্যার। সেবার আর একবার হলো কি, ওঃ ভাবলেও গায় কাঁটা দেয় মশাই, আমি তখন—

যাক্, আমাকে আর ওসব গল্প বলবেন না। আমার ভালো লাগে না।

—শুনুন না, ভয়ের কিছু নেই, সেবারে গত বছরে জানুয়ারি মাসে, না জানুয়ারি না তখন গরম পড়ে গেছে, মার্চ মাসে, হ্যাঁ, ষোলোই মার্চ, রাত্তির হবে তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা, আমি তখন ডানলপ ব্রীজ থেকে ফিরছি ফুল স্পীডে চালিয়ে···

···মা! মা! মা! অভিজিৎ, শানু, কানু, ওঃ, ওঃ, খুকু, মা, মা। যে ভয় করছিলুম। আমার মনে পড়ে গেল, মনে করব না ভেবেছিলুম এর মধ্যে দু'একবার শব্দগুলি চকিতে ঘুরে গিয়েছিল, এবার সম্পূর্ণ ফিরে এলো, ট্যাক্সীওয়ালার একটা কথাও আমার কানে গেল না, আমার দাদার কথা মনে পড়ল।

···মা, মা, অভিজিৎ, ওঃ, ওঃ, খুকু—মাঝরাত্তিরে দাদা মশারি ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে এমনই অসম্ভব ভয়ার্ত চিৎকার যে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙতে এক মুহূর্ত দেরী হয়নি। সবচেয়ে আগে মায়ের ঘুম ভেঙ্গেছিল, মা পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দাদাকে ধরল, কি হলো অমু, কি হল ; অমু, অমু।

দাদা সারা ঘরময় ছুটোছুটি করছিল। আমার অসম্ভব পেটে ব্যথা হচ্ছে মা, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। দাদা ছুটে গেল দরজার কাছে, ফিরে এসে পরমুহূর্তে আলমারিটা ধরে দাঁড়াল, পরে

বিছানায় শুতে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়াল, মরে গেলাম, মা, শেষ হয়ে গেল, উঃ।

মা ছুটে গিয়ে দাদার মাথাটা বুকে চেপে ধরল। কতদিন পর দাদার মাথা মায়ের বুকে—বোধহয় কুড়ি বছর। একটু শান্ত হতে না হতেই দাদা আবার সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছুটে গেল, ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা, পায়ের শব্দ হতে লাগল প্রচণ্ড, হাতের ধাক্কায় একটা ব্র্যাকেট উল্টে পড়ে গেল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ডাক্তার, ডাক্তার,—তারপর বললেন, একটু নুন জল খা। আমি রান্নাঘরে ছুটে গেলাম নুন আনতে, মা আমার পিছনে পিছনে, মা বলল আমাকে, আমার বুক কাঁপছে, একি হলো, আমি বললুম, কোন ভয় নেই।—না, না, মা বলল, আমার বুক কাঁপছে।

দাদা কাল ভোর বেলা দিল্লি যাবে ইণ্টারভিউ দিতে, আমরা সকাল সকাল শুয়েছিলাম, খাওয়ার সময়ও দাদা কত গল্প করেছে।

নুন এনে দাদার হাতে দিলাম। জল জল দাদা এক জীবনের তৃষ্ণা নিয়ে যেন হাহাকার করে উঠল, নিজেই ছুটে গিয়ে কুঁজোটা তুলে নিল, কুঁজোটা উপুড় করে গলায় ঢালছে আমি দেখলাম, দাদার হাত কাঁপছে—দাদা আমাদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বলশালী, খুব গুছানো স্বভাব, রোজ ব্যায়াম করত, কাল দিল্লি যাবে বলে সাবান, টুথপেষ্ট, তোয়ালে কিনে এনে গুছিয়ে রেখেছে। দাদার হাত থেকে কুঁজোটা পড়ে ভেঙে গেল। দাদা আরও ছটফট করতে লাগল, মরে গেলুম, মা একি হলো, মা, অভিজিৎ, অভিজিৎ, ওঃ মা!

আমি মা আর খুকু তিনজনে মিলেও দাদাকে ধরে রাখতে পারলুম না, দাদা আহত সিংহের মতো সারা ঘরে দাপাদাপি করতে লাগল, যেন দাদাকে অশরীরী কিছু ভর করেছে। একবার শুতে যাচ্ছে, আবার উঠেই ছুটছে, দরজা ধরতে গিয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে মুখ লুকোতে গিয়ে ছটফট করে চলে যাচ্ছে, শেষবার খাটে শুতে গিয়ে খাটের কোণায় প্রচণ্ডভাবে মাথা ঠুকে গেল, দাদার

মাটিতে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল, কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। জল আর স্মেলিং সল্ট অমনু, অমনু,মা ডাকতে লাগলেন।

শানু ও কানু গিয়েছিল ডাক্তারকে ডাকতে, ছুটে গিয়ে ডাকাতের মতো দুমদাম করে দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাক্তারকে তুলিয়ে দু'জনে দু'হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। ডাক্তার যখন ঢুকলেন, তখনও দাদার জ্ঞান ফেরেনি, নাক ও ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

ডাক্তার এসে হাতটা ছুঁয়েই বললেন, আর উপায় নেই। তবে আর একটু আগে এলেও বোধহয় কোন লাভ হতো না।

সকালবেলা দিল্লির ট্রেন ধরতে হবে বলে শোবার সময় দাদা মাকে বলে রেখেছিল খুব ভোরে ডেকে দিতে। তার বদলে নিজেই মাঝরাত্তিরে উঠে দাদা অন্য কোথায় চলে গেল।

দাদার মৃত্যুতে সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল, ওর অভিজিৎ, অভিজিৎ বলে ডাকা। অভিজিৎ নামে কারুকে আমরা চিনি না, দাদা বন্ধুদের মধ্যেও ও নামে কেউ নেই। অন্তত মৃত্যুর আগে নাম ধরে ডাকবে এমন কোন লোকের কথা আমরা শুনিনি। সবচেয়ে আশ্চর্য যদিও দাদার মৃত্যু, অমন স্বাস্থ্যবান ও সাবধানী ছিল দাদা, মাত্র মিনিট দশেক নোটিশ পেয়েছিল মৃত্যুর। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, সেদিন বিকেলবেলা অতি সাবধানী দাদা একটা ডাক্তারখানা থেকে কলেরার ইঞ্জেকশন নিয়েছিল, সেই ইঞ্জেকশনে ভেজাল ছিল, সম্ভবত সেইটাই দাদার মৃত্যুর কারণ।

দিল্লি যাবার জন্য কেনা জিনিসপত্র দাদার আলাদা করেই রাখা ছিল অনেকদিন। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দাদার কেনা সেই টুথপেস্ট, সাবান, ব্লেড ব্যবহার করিনি। একদিন অন্যমনস্কভাবে আমি সেই টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজছিলাম বাথরুমে হঠাৎ যেন আমার কিরকম অন্যরকম লাগল, আমার মাথার মধ্যে যেন দিল্লি দিল্লি এই শব্দের ঢেউ হালকাভাবে বয়ে গেল, আমি লক্ষ্য

করলাম, ব্রাশটা আমি খুব সাবধানে ওপরে ও নীচে সমভাবে চালাচ্ছি, দাদার এ-রকম স্বভাব ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরণ হলো। হঠাৎ আমার মনে হল, এই টুথপেস্টের টিউবের মধ্যে দাদার অসম্পূর্ণ বাসনা ঘুমিয়ে আছে। মানুষ মরে কিন্তু বাসনা মরে না। আমার মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম।

—তারপর তিন মাস হাসপাতালে পড়েছিলাম, এই দেখুন এখনো কাটা দাগ আছে। ড্রাইভার তখনও গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ওর কাটা দাগের দিকে না তাকিয়ে চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, বেঁধে দিন আমি এখানে নামব।

—টালীগঞ্জ যাবেন না?

—না।

নেমে, ক্যাথিড্রালের পাশের রেলিং ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। দাদার কথা মনে পড়লেই আমার নিজেরও পেটে একটা ব্যথা হয়। হয়তো ব্যথাটা কাল্পনিক, কিন্তু এক এক সময় এমন প্রবল হয় যে, দুটো ট্যাবলেট না খেলে কমে না। এখন অবশ্য ব্যথাটা চট করে কমে এল, কারণ সন্ধ্যে হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি হবে কি হবে না আমি অন্যমনস্কভাবে ভেবেছিলুম। রাস্তায় মানুষের অতিশয় হৈ-চৈ, ট্রাম ও বাসের শব্দ, লাল ও সবুজ আলোর শব্দ অসম্ভব গর্জন করে একটা জেট প্লেন উড়ে গেল, সন্ধেবেলা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আউটরাম ঘাট থেকে জাহাজের গম্ভীর ডাকও আমি আগে কখনো শুনিনি।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বেশ ভালো লাগল, এ ফুটপাথ দিয়ে লোক হাঁটে না, আমি প্রায় একা ছিলুম। আস্তে আস্তে, খুব গোপনে চেতনার অগোচরে একটা অন্যরকম ব্যাপার হতে লাগল, খানিকটা বাদে আমি টের পেলুম। সব শব্দগুলো এক হয়ে মিশে আসছে। ট্রাম বাসের শব্দ, জনকণ্ঠ, প্লেন ও জাহাজের ডাক মিশে

গিয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা আওয়াজ উঠছে। এ আওয়াজ, এ শব্দ আমার মৃত্যুর শব্দ মনে হল। মৃত্যুর শব্দ কি আমি জানি না, অথবা মৃত্যুর আগে কেউ এ শব্দ শোনে কিনা আমি জানিনা— কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস হলো আমার, আমার মৃত্যুর শব্দ। মনে পড়ল, আমার কুষ্ঠিতে আছে অপঘাতে মৃত্যু। 'কুষ্ঠি' কথাটা খুব হাস্যকর আমি জানি, ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না, ওসব ভুয়ো, মেলে না, কে না জানে।

আমারও মেলেনি। ছিল দেশবিখ্যাত বিদ্বান হবো, মেলেনি, ছিল বিপুল ধন উপার্জন ও ব্যয় করব, মেলেনি, ছিল পরমা সুন্দরী রমণীর ভালবাসা পাব, একেবারে মেলেনি, কিন্তু জানি নিশ্চিত, দৃঢ়ভাবে জানি, শেষটা মিলবে অপঘাতে মৃত্যু ঠিক মিলবে। আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে লেলান্ড, কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় পাখা ভেঙে পড়বে, কিংবা হঠাৎ আততায়ীর ছুরি অথবা মাঠের মধ্যে বজ্রাঘাত, অথবা সমস্ত আকাশ কালো করে অ্যাটম বম বা বিষ বাষ্প, দেশসুদ্ধ লোক মরলেও আমার আলাদা মৃত্যুর আলাদা ভয়। আমি জানি, মৃত্যু আমাকেও নোটিশ দেবে না।

সেই সময় সমস্ত রাস্তা জুড়ে ভেসে উঠল, একটা মেয়ের মুখ, আকাশের দিকে ফেরানো মুখ, যে মুখ মাত্র একবার আমি দেখেছি কিন্তু আর ভুলতে পারিনি। আর "যদি অন্তত আর একটা বছর বাঁচাতে পারতুম।" এক বছর ? এক বছর ? অসম্ভব, ঢের সময়, তিন মাস, এক মাস, একদিন অন্তত একবেলা। কমপক্ষে আজকের সন্ধেটা বেঁচে থাকার বিষম ইচ্ছে হল আমার, একটা সন্ধে কোথায় গেলে বাঁচব ? টালীগঞ্জে রমলার কাছে ? না। মনে পড়ল কোথাও আমার বন্ধুবান্ধবরা বিস্মৃতি নিয়ে হৈ-হল্লা, বেলেল্লা করছে, ইচ্ছে হল সেখানে গিয়ে বাঁচি, একটা সন্ধে বেঁচে থাকার লোভে আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগলাম, রাস্তা পেরিয়ে ট্রাফিক লাইটের কথা ভুলে গিয়ে।

## প্রেমিক ও স্বামী

যুবকটির সঙ্গে দোকানটায় ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছিল নিখিলের। তখন যুবকটি নিখিলের চোখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনো কথা বলে নি।

নিখিলও ঠিক মনে করতে পারলো না যুবকটিকে আগে কোথায় দেখেছে কিংবা তার নাম কি। অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যাক গে, নিখিল আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না। সিঁড়ির ওপর একটা লোহার টুকরো পড়ে ছিল, নিখিল শান্তাকে বললো, দেখো, হোঁচট খেয়ো না।

রবিবারের সকাল। নিখিল শান্তাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের একটা নিলামের দোকানে এসেছে। বিশেষ কোনো কিছু কেনার যে উদ্দেশ্য আছে তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু চোখে লেগে যায়। এখানে সাহেব বাড়ির রুপো বাঁধানো আয়না থেকে শুরু করে শ্বেতপাথরের টেবিল পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, কিছু না কিনেও দু'একবার দাম হাঁকতে মন্দ লাগে না।

রোজ-উডের একটা ছোট্ট বেড সাইড টেব্‌ল খুব পছন্দ হয়েছে শান্তার, সে দাম বলতে শুরু করেছে। আরম্ভ হয়েছে পনেরো টাকা থেকে—একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী এবং একজন গম্ভীর চেহারার পার্শী মহিলা অনবরত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন—পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত দর ওঠার পর নিখিল ইশারা করলো শান্তাকে। এরপর জেদাজেদির জন্য দাম বেড়ে যাবে—সাধারণত এরকমই হয়। শান্তা তবু বললো, ষাট টাকা। তারপর থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত পার্শী মহিলাই সেটা কিনে নিলেন একানব্বই টাকায়।

শান্তা নিখিলের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললো, তুমি বারণ করলে কেন? জিনিসটা ভালো ছিল কিন্তু!

নিখিল বললো, তা বলে অত দাম দেবার কোনো মানে হয় না। রোজ-উড হোক আর যাই হোক—ঐটুকু তো জিনিস, পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হয় না।

এক সময় সেই যুবকটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। শান্তার দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

শান্তা চিনতে পেরেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, ওমা, আপনি? বাঃ, কেন চিনতে পারবো না! আপনি এখন কলকাতায় আছেন?

যুবকটি এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসম্মত হাসি দিয়ে বললো, আপনি ভালো?

নিখিল এবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো ওকে। ছেলেটির নাম অলোক ব্যানার্জি, দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ।

নিখিল চট্‌ করে একটা মজার ব্যাপার ভেবে নিল। মজাটা হচ্ছে এই, দোকানে ঢোকার মুখে সে ছেলেটিকে চিনতে পারে নি—ছেলেটিও নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি।—তা হলে কথা বলতো। ছেলেটি তখন শান্তাকে দেখে নি। কিন্তু ছেলেটি শান্তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এবং শান্তাও চিনতে পেরেছে ওকে। অথচ এক সঙ্গেই তো আলাপ।

দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। নিখিল আর শান্তা সদ্য বিয়ে করে গিয়েছিল হনিমুনে। তখন বর্ষাকাল—বিশেষ লোকজন নেই। হোটেলে পাশের ঘরটাতেই থাকতো এই অলোক ব্যানার্জি। নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেছিল।

অলোক শান্তাকে বললো, টেব্‌লটা না কিনে ভালোই করেছেন। ওর লক্‌টা খারাপ, আমি আগেই দেখেছি।

শান্তা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কলকাতায় থাকেন?

অলোক বললো, হ্যাঁ, আপাতত দু'এক বছরের জন্য কলকাতায়।

দার্জিলিং-এ যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন অলোক বলেছিল, ও জামসেদপুরে থাকে। একলা একলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিল কেন ? সে সম্পর্কে অলোক জানিয়েছিল যে, প্রায়ই সে একা একা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে তার ভালো লাগে না। কখনো পাহাড়ী জায়গায়, কখনো সমুদ্রের ধারে—ছুটি পেলেই সে চলে যায়।

ব্যাপারটা খুব রোমাণ্টিক মনে হয়েছিল ওদের কাছে। যুবা বয়েসে সাধারণত কেউ একা একা বেড়াতে যায় না। নিখিল যেমন কখনো যায়নি। হয়, যাওয়া হয়, বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে—অথবা বিবাহিত হলে স্ত্রীর সঙ্গে।

একদিন জলাপাহাড় অঞ্চলে একটা পাথরের ওপর একা অলোক ব্যানার্জিকে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে দেখে শান্তা পরিহাসের সঙ্গে বলেছিল, দ্যাখো, দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্যর্থ প্রেমিক। কিংবা কবি-টবি নয় তো! নইলে সন্ধেবেলা কেউ ঐরকম একা বসে থাকে ?

শান্তা আর নিখিল দার্জিলিং-এ ছিল দশদিন। এর মধ্যে অলোক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে। কখনো বেড়াতে যাবার মুখেই দেখা হওয়ায় অলোক ব্যানার্জি বলেছে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন ? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্!

নতুন বিয়ের পর যারা হনিমুনে গেছে - অন্যদের উচিত নয় তাদের সঙ্গে বেশী দেখা করা। তাদের নিরালায় থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অলোক ব্যানার্জি তা বোঝেনি। এ নিয়ে শান্তা প্রথম প্রথম দু'একবার বলেছে, ভদ্রলোক বড্ড গায় পড়া—আমরা আলাদা কোথাও যাবো—তার উপায় নেই। ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হবেই। নিখিল উদার ভাবে বলেছে, তাতে কি হয়েছে, লোকটা তো খারাপ নয়! কথাবার্তা বেশ ভদ্র! পৃথিবীতে একেবারে নিরালা জায়গা আর তুমি কোথায় পাবে ?

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শান্তা লোকটিকে মোটামুটি সহ্য করে নেয়। অলোক ব্যানার্জি সবসময় বেশ ফিটফাট সেজেগুজে থাকে, ব্যবহার খুবই ভদ্র, নানারকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। এরকম লোক গায়ে পড়া হলেও এড়ানো যায় না।

নিখিল দু'চারদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অলোক ব্যানার্জি পেশায় সেল্স রিপ্রেজেন্টেটিভ। নানা জায়গায় ওকে একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় চাকরির কারণে। সেটাকেই ও একটু রোমান্টিক রূপ দিয়ে বলেছে। হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে অলোক ব্যানার্জি'র কথাবার্তা শুনে নিখিল বুঝতে পেরেছে—এই হোটেলেই সে বছরে দু'তিনবার আসে। অথচ শান্তার কাছে কথায় কথায় ও একবার বলেছিল, দার্জি'লিং এ এই ওর প্রথম আসা। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুম-এ গিয়েছিল, শুধু ওদের সঙ্গ পাবার জন্যই। নইলে দার্জি'লিং-এ বারবার এসে কেউ প্রতিবারই ঘুম কিংবা টাইগার হিল্স দেখতে যায় না।

নিখিল অবশ্য এ কথাটা বলে নি শান্তাকে। ঐটুকু মিথ্যে কথা বলে লোকটি এমন কিছু দোষ করে নি। শুধু শুধু ওর সম্পর্কে শান্তার ধারণা খারাপ করে দেবার কোনো মানে হয় না। নিখিল শান্তার স্বামী, আর অলোক ব্যানার্জি'র চোখে শান্তা এক-জন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলা। একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলার কাছে নিজেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য করে তোলার জন্য ওরকম একটু আধটু মিথ্যে কথা সব পুরুষমানুষই বলে। নিখিলও হয়তো বলতো। সংসারে মন টেকে না এমন একজন যুবক সমুদ্র কিংবা পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—এই চরিত্রটি মেয়েদের পছন্দ হবে। তার বদলে, চাকরির জন্য নানা জায়গায় টুরে যেতে হয় এই সাদা সত্যি কথাটা এমন কিছু না।

যুবকটি শেষ পর্যন্ত শান্তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। শেষের দিকে শান্তাকে দেখলেই একটা গদগদ ভাব এসে যেত।

মাথা নুইয়ে নুইয়ে এমন ভাবে কথা বলতো যে দেখলেই প্রেমিক প্রেমিক মনে হয়। কখন নিখিল একটু দূরে যাবে—শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলা সম্ভব হবে—সেই সুযোগ খুঁজতো।

সদ্য বিবাহিত এবং স্বামী সঙ্গে উপস্থিত—এমন মেয়ের প্রেমে পড়া যে উচিত নয় সেটা বুঝতে পারে নি ছেলেটি! তা আর কি করা যাবে। প্রেমে তো সবাই হিসেব করে পড়ে না! ভালোবাসা অন্ধ—একথা আর তাহলে বলে কেন? নিখিল এইসব ভাবতো। নিখিল মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতো। হঠাৎ বেড়াতে এসে দেখা, একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনটা একটু নরম হয়ে যাওয়া—তার সঙ্গ পাবার একটু ইচ্ছে—এর বেশী কিছু তো নয়! এতে দোষের কিছু নেই।

নিখিল অবশ্য মনে মনে বুঝতে পারলো, অলোক ব্যানার্জি মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তা তো করবেই। মনে মনে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তার স্বামীকে কে-ই বা পছন্দ করে! স্বামীরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য প্রাণী। তাদের কেউ-ই পছন্দ করে না। নিখিল মাঝে মাঝে নিজেকে অলোক ব্যানার্জি'র জায়গায় বসিয়ে ভাবতো, সে যদি শান্তার মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে এইরকম প্রেমে পড়তো—তাহলে সেও কি মনে মনে চাইতো না—স্বামীটা এখানে না থাকলেই ভালো হয়! বস্তুত এরকম ঘটনা তো নিখিলের জীবনেও ঘটেছে।

নিখিল অবশ্য অলোক ব্যানার্জি'কে খুব বেশী খুশী করতে পারে নি। অলোকের সঙ্গে শান্তাকে বেশীক্ষণ একা থাকার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে পর-পুরুষের কাছে রেখে দূরে সরে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেটা কি ভালো দেখায়? ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যতদূর যা করা যায়, নিখিল তাই করেছে।

শান্তাও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি? নিশ্চয়ই বুঝেছিল এবং বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল। একটি ফিটফাট চেহারার

সুদর্শন যুবক সব সময় খাতির করে, প্রশংসা করে কথা বলছে—এটা কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে? এমন কি সদ্য বিবাহিতা মেয়েদেরও ভালো লাগে। এর প্রতিদান হিসেবে শান্তা আর কি-ই বা দিতে পারে, টুকরো টুকরো হাসি আর দু'চারটে রহস্য-ঘেঁষা সংলাপ। মেয়েদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না। মেয়েরা যেমেয়ে—এটাই তাদের মস্তবড় গুণ, ছেলেদের কাছে। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। নিখিল জানতো, শান্তা কক্ষনো চুপিচুপি রাত্তিরবেলা অলোক ব্যানার্জি'র ঘরে ঢুকবে না। শান্তা ভালো মেয়ে এবং সে নিখিলকে সত্যিই ভালবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে এইরকম দু'একটা ছোটখাটো প্রেমিক-প্রেমিকার সাইড ক্যারেক্টার এলেও কোনো ক্ষতি হয় না।

জলাপাহাড়েই আর একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেদিনও ওখানে অলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিখিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল অলোক ইচ্ছে করেই সেখানে আগে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক জানতো ওরা এদিকেই আসবে। এরকম অনেকেই করে। অলোক ওদের দেখে বললো, আরেঃ! আপনারাও আজ এদিকে এসেছেন? আমার কিছু করার উপায় নেই, তাই ঘুরতে ঘুরতে এদিকটায় এলাম।

নিখিল বললো, চলুন, এক সঙ্গেই বেড়ানো যাক।

শান্তা বললো, বেড়াবার কি উপায় আছে? সারাদিন ধরেই তো বৃষ্টি। একদিনে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না!

অলোক বললো, আজ মেঘ সরে যাচ্ছে! দেখুন, দেখুন—কি রকম উড়ে যাচ্ছে হালকা হালকা মেঘ। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতে পারে!

নিখিল ওকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি রেন কোট কিংবা ছাতা আনেন নি কেন? শুধু শুধু ভিজছেন!

অলোক বললো, একটু ভিজলে কি আর হবে!

নিখিলদের সঙ্গে একটা মাত্র ছাতা। তাতে তারা স্বামী-স্ত্রী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গেলে কোনো দোষ নেই। হনিমুনের সময় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি আর একজন ভিজতে ভিজতে গেলে অস্বস্তি লাগে। নিখিল বললো, আপনিও আসুন না!

অলোক খুব আপত্তি করা সত্বেও নিখিল তাকে টেনে আনলো। তবে,একছাতারতলায় স্বামী,স্ত্রী আর স্ত্রী-র প্রেমিককে কিছুতেই ধরানো যায় না—তাতে তিনজনেরই অসুবিধে। যাই হোক একটু-বাদে বৃষ্টি কমে গেল অনেকটা। পাউডারের মতন মিহি মিহি বৃষ্টি এসে লাগছে গায়—নিখিল ছাতা গুটিয়ে ফেলেছে। বহু দূর পর্যন্ত নিচু উপত্যকায় যেন হালকা একটা জাল বেছানো রয়েছে।

এদিকটাখুবইনির্জন, আর কোনো ভ্রমণ-পিপাসুকে দেখা যায় না। এই সময় শান্তার হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, ছোট বাথরুম। শান্তা ইসারায় নিখিলকে জানালো সে কথা —এখন নিখিলকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা সৌখিন প্রেমিকদের কাছে বলা যায় না, স্বামীকেই বলতে হয়।

এমনিতে কোনো অসুবিধে ছিল না। কাছাকাছি মানুষজন নেই—একটা কোনো গাছের আড়ালে শান্তা বসে পড়তে পারতো। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু অলোক রয়েছে যে! অলোকের সামনে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যে লজ্জার ব্যাপার। নিখিল শান্তাকে ইসারায় জিজ্ঞেস করলো, হোটেলে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। শান্তা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ওরা অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

অগত্যা নিখিলকে ব্যবস্থা করতেই হলো। একটা সুবিধামতন গাছ দেখে নিখিল গম্ভীর মুখ করে শান্তাকে বললো,তুমিকোথায় যাবে বলছিলে যাও, আমি আর অলোকবাবু রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি!

অলোক প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। অবাক হয়ে শান্তাকে

মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভাগ্যিস কিছু জিজ্ঞেস করে নি। অলোক যেমন সব সময় শান্তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য ব্যস্ত, এ ব্যাপারেও সে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ফেললে হয়েছিল আর কি। যাই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেচারা খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

নিখিল অলোককে নিয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই নিন, সিগারেট নিন!

তারপর আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। দু'জনের মধ্যে কোনোরকম মতের মিল নেই--কথাবার্তা আর কি হবে? নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো, অলোক বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কথা বলায় তার একটুও মন নেই। যেন তার ভেতরের একটা দুর্বার ইচ্ছে চাইছে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে শান্তাকে। এটাও তো স্বাভাবিক। নিখিল তার স্ত্রীকে প্রতি রাত্রে দেখে তার এখনওরকম ইচ্ছে জাগবার কথা নয়। কিন্তু একজন সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে একজন অনাত্মীয় পুরুষের তো সেরকম মনোভাব হবে না। ভদ্রতা সভ্যতার মোড়ক দিয়ে এটাকে যতই ঢেকে রাখা যাক—ব্যাপারটা তো জলের মতন সোজা। বেশ কৌতুক বোধ করে নিখিল মিটি-মিটি হাসতে লাগলো।

যাই হোক, সেবার নিখিলরা চলে আসবার পরও অলোক ব্যানার্জি দার্জিলিং-এ থেকে যায়। অলোক ওদের স্টেশন পর্যন্ত পেঁছে দিতে এসেছিল। ঠিকানা বিনিময়, আবার দেখা হবার আশ্বাস ইত্যাদি যা যা হয়—সেবার তো হয়েছিলই। অলোক জামসেদপুরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল ওদের। নিখিলও বলেছিল, কলকাতায় এলে অলোক যেন নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসে। চিঠিপত্রেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ থাকবে ইত্যাদি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও নিখিল দেখলো, অলোক তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তার প্রেমিক পেছনে পড়ে রইলো।

চলে আসবার আগের দিন নিখিল টের পেয়েছিল যে অলোক ব্যানার্জি বিবাহিত। কি একটা কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। এটা জানার জন্য নিখিলের কৌতূহল ছিল, অথচ জিজ্ঞেস করাও যায় না সবাসরি—তাই সে প্রসঙ্গটা ধরে ঠিক বুঝে নিয়েছে। অলোক অবশ্য কোনোদিনই বলে নি যে সে বিবাহিত নয়—কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথা সে একবারও উচ্চারণ করে নি এবং তার ঐ একা-একা ভাবটার জন্য যেন ধরেই নিতে হয় যে সংসারেও সে একা। শান্তার সেই রকমই ধারণা।

নিখিল অবশ্য শান্তার এই ভুলটাও ভেঙ্গে দেয় নি। অলোক ব্যানার্জি এ কথাটা চেপে গেছে, বেশ করেছে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিবাহিত লোকদের কি প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ? পৃথিবীতে ঢের ঢের বিবাহিত পুরুষই প্রেম করে। তবে মেয়েরা তাদের প্রেমিক হিসেবে বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে অবিবাহিত ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। প্রেমিক—এই ধারণাটাই বিবাহের সম্পর্কের উর্ধে যেন। নিখিল চেয়েছিল শান্তার এই সৌখিন প্রেম-প্রেম খেলাটুকু অধিকৃতই থাক। শেষ মুহূর্তে ধারণা ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা।

অলোকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা হয় নি অবশ্য। বেড়াতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই আলাপ আর বেশীদূর গড়ায় না। তাছাড়া দার্জিলিং-এ যাকে ভাল লাগে, কলকাতায় তাকে আর ভালো না-ও লাগতে পারে। কখনো কখনো ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অলোক ব্যানার্জির প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করেছে বটে—তবে বেশী আর কিছু না।

আবার হঠাৎ এই নিলামের দোকানে দেখা। অনেকক্ষণ ওরা একসঙ্গে রইলো। অলোক কিনে ফেললো একটা বুক কেস এবং প্রায় তার পেড়াপিড়িতেই শান্তাকে কিনতে হলো এক জোড়া

ফুলদানি। দার্জিলিং-এর গল্পও হলো অনেকক্ষণ এবং অলোককে একদিন তাদের বাড়িতে অবশ্যই আসতে বলা হলো।

কিন্তু আসতে বলা মানেই নেমন্তন্ন করা নয়। বিশেষ কোনো দিন ঠিক করে নেমন্তন্ন করা। আর, আপনি একদিন আসবেন—এই বলার মধ্যে অনেক তফাৎ। নিখিল নেমন্তন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি। শুধু তা-ই নয়, অলোক ব্যানার্জিকে আজ দেখে সে খুশী হয় নি। শান্তা আর অলোকের মধ্যে কথা হয়। তাকে স্বামী সেজে পাশে সারাক্ষণ বোকা বোকা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া ভদ্রলোকের যেরকম প্রেমে পড়ার বাতিক, তাতে বেশী প্রেম জমিয়ে ফেললেই মুস্কিল। দার্জিলিং-এ ছুটির সময় সে এ ব্যাপারটাতে মজা পেয়েছিল—কলকাতায় নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঠিক সহ্য করা যায় না। কোনো ভদ্রলোক কি তার স্ত্রীকে সব সময় পাহারা দিতে পারে? তা ছাড়া, কলকাতায় শান্তার তো পুরনো দিনের দু'তিনজন বন্ধু আছেই—দার্জিলিং-এর বন্ধুকে তার কলকাতায় দরকার নেই।

নিখিল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল। অলোক যদিও একবার বলেছে যে সে কলকাতায় ফার্ন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের একবারও যেতে বলে নি। ভদ্রলোকের স্ত্রী-কে কি খুব কুৎসিত দেখতে?

বাড়ি ফিরে শান্তা বললো, ভদ্রলোক বেশ মজার, তাই না? সব সময় এত বেশী বেশী ভদ্রতা দেখাতে চায় যে বোকা বোকা দেখায়!

নিখিল গম্ভীর ভাবে বললো, ও দেখছি, এখনো তোমার প্রেমে পড়ে আছে!

শান্তা চোখ কুঁচকে হাসি মুখে বললো, তবে? তুমি ভাবো কি? এখনো লোকে আমার প্রেমে পড়ে!

নিখিলও না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো,

দুপুরবেলা যখন আমি বাড়ি থাকবো না—তখন যেন না আসা শুরু করে! দেখো বাবা!

শান্তা নিখিলকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বড্ড অসভ্য!

আসবার আগেই আর একদিন নিখিলের সংগে তার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। ছুটির দিন, তবু নিখিলের অফিস ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দেখলো, সংগে একজন মহিলাকে নিয়ে অলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিল আগে দেখেও কথা বলে নি—হয়তো ছেলেটি আর একটি প্রেমিকা জুটিয়েছে—এ সময় কথা বলতে গেলে বিব্রত হবে। মহিলাটি বিবাহিতা—বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার ন্যাক আছে ওর।

অলোক ব্যানার্জি'ই নিজে কথা বললো। ডেকে বললো, এই যে নিখিলবাবু, কি খবর?

আলাপ হলো। মহিলাটি অলোকের স্ত্রী। মনে হয় সাত আট বছরের পুরনো বিয়ে-এর আগে যে অলোক নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে এখন আর তার মুখে কোনো লজ্জার চিহ্ন নেই। কোথাও বসে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিল অলোকই—কিন্তু নিখিলের তাড়া আছে। তখন ঠিক হলো, ট্যাক্সি পাওয়া তো একটা সমস্যা—সুতরাং একটা ট্যাক্সি পেলে তাতে ওরা এক সংগে যাবে। নিখিলের বাড়িই দূরে, নিখিল ওদের নামিয়ে দেবে।

অলোকের স্ত্রীর নাম মমতা, ভারী সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে। নিখিলকে বললো, আপনাদের কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার স্ত্রী তো খুব সুন্দরী। একদিন নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি।

নিখিল বললো, তার আগে আপনারা একদিন আসুন।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অতিকষ্টে। নিখিল সামনে বসতে যাচ্ছিল,

অলোক বললো, না, না, আপনি ভেতরে আসুন। অনেক জায়গা আছে।

মমতা মাঝখানে বসলো, দু'পাশে দু'জন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অলোক খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। অথচ দার্জিলিং-এ দেখেছে, তার সুন্দর কথার ফোয়ারা ছোটে। এমনকি এ কথাও বোঝা যাচ্ছে, অলোক তার স্ত্রীকে একটু একটু ভয় পায়।

নিখিল হঠাৎ দুম করে মমতাকে বলে ফেললো, আপনি ভারি সুন্দর সেন্ট মেখেছেন তো। চমৎকার গন্ধটা।

মমতা একটু লজ্জা পেল। নিখিল তাকাল অলোকের দিকে। অলোকের মুখখানা উদাসীন ধরনের। ভূমিকা বদলে গেছে— অলোক এখন আর প্রেমিক নয়, সে স্বামী। যে-কোনো স্বামীর মতনই গো-বেচারা ভঙ্গিতে সে অন্য লোকের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাপারটায় নিখিল এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মমতাকে বললো, শুনুন, সামনের সোমবার আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আপনারা খাবেন। আসতেই হবে কিন্তু, বুঝলেন।

বাকিটা রাস্তা নিখিল আর মমতাই শুধু কথা বলে গেল। অলোকের আর কোনো উৎসাহ নেই, সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো অন্যমনস্ক ভাবে।

## সন্ধেবেলা রক্তপাত

আগের দিন সন্ধেবেলাতেই একটু একটু সন্দেহ হয়েছিল, সকালবেলা উঠে দেখলুম, আমার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ উঠেছে। সাদা, টুসটুসে, ব্যথা কি! আয়নায় দেখা গেল, আগুনের শিখার মতন, কাছাকাছি হাত নিয়ে যেতে ভয় হয়। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

হয় এ-রকম আমার মাঝে-মাঝে। গালে, থুতনিতে। সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগে ঠোঁটের কোণায় হলে। সেই চোদ্দ-পনেরো বছর থেকে শুরু হয়েছে। বড় পিসীমা সে সময় বলতেন, ও কিছু না, বয়েস-ফোঁড়া, সময়কালে সেরে যাবে। কি জানি বড় পিসীমা সময় বলতে কি বুঝিয়েছিলেন, সাতাশ বছর বয়েস হলো, এখনও আমার নিষ্কলঙ্ক মুখের সময় আসে নি? বড় পিসীমা যে দিন মারা যান, সে দিন দাড়ি কামাতে গিয়ে একটা ব্রণ কেটে ফেলায় কী রক্তই বেরিয়েছিল আমার, খুব মনে আছে।

ব্রণ আমার গা সহা হয়ে গেছে। সাদা হয়ে এলেই আমি দেশলাই জেলে একটা সেফটি-পিন পুড়িয়ে প্যাট করে গেলে দিই। ভেতরের সাদা জিনিসটা টিপে বার করে দিলে চুপসে যায়, তখন আর অতটা চোখে পড়ে না। নইলে, মুখের ওপর পাকা ব্রণ থাকলে অনেকে ভালো করে আমার মুখের দিকে তাকাতে চায় না—কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি নিজে তো দেখেছি—অন্য কারুর মুখ ভর্তি ব্রণ দেখলে আমার গা বমি বমি করে, তাকাতে ইচ্ছে করে না।

কপালের ওপর ব্রণ, এতে একটা সুবিধে হয়েছে অবশ্য, দাড়ি কামাতে অসুবিধে হবে না, কেটে যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ব্রণ গেলে দেওয়াও যাবে না। কপালের ওপর ক্ষত তৈরী

করতে নেই—এটা শুধু কুসংস্কার নয়—দারুণ সেপ্টিক হয়ে যেতে পারে। ইরিসিপ্লাস না এই ধরনের কি যেন একটা অসুখ আছে—অরুণেশ দাস মজুমদার বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তো, তিনদিনের ছুটিতে মেদিনীপুরের দেশের বাড়িতে গেল—আর ফিরলো না, বৌদির শেলাইয়ের সূঁচ দিয়ে কপালের ব্রণ গেলেছিল। অরুণেশ হঠাৎ মরে গেল বলেই সেবার আমি ম্যাগাজিন এডিটর হতে পেরেছিলাম। যতই খারাপ দেখাক, কপালের ব্রণ আমি গালতে পারবো না। কিন্তু আজ গায়ত্রীর বুকে আমার কপাল সমেত মুখখানা একবার চেপে ধরবো ভেবেছিলাম।

গায়ত্রী ব্রণ দেখলে কখনো ঘেন্না করে না, অন্তত সে রকম কোনো ভাব কখনো দেখায় নি। বরং গায়ত্রী আমার জন্য নিত্য-নতুন ওষুধ কিনে আনে। শাঁখের গুড়ো, হজমের ওষুধ, হরেক রকম মলম। গায়ত্রীর মসৃণ মুখের চামড়া, একটা দাগ নেই, কোনোদিন একটা ঘামাচিও হতে দেখিনি—তবু ব্রণের ওষুধ ও কার কাছ থেকে এবং কোন প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আমি জানি না। বলেও না কখনো। গায়ত্রী ওর পাতলা স্বচ্ছ হাতখানি আমার মুখে বুলোতে বুলোতে কতদিন বলেছে, ছেলেমানুষ, তুমি এখনও একটা ছেলেমানুষ।

চন্দন কিংবা চুন কিংবা ষ্টিকিং প্লাস্টার লাগাবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তাহলে প্রথমেই চোখে পড়ে, চোখের সামনে ক্যাট ক্যাট করে। কপালের ঠিক মাঝখানে ঐ দৃশ্যমান কলঙ্ক নিয়ে রাস্তায় হাঁটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোদ্দ বছর বয়স থেকে যার ব্রণ উঠছে, সেই লোকেরও আজ কপালের ওপর একটা মাত্র ব্রণ ওঠায় সত্যিকারের মন খারাপ হলো। আমি গোটা তিনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অন্তত আজকের দিনটায় ওটা না উঠলে হতো না! দেড় মাস পর আজ গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা

হবে। হঠাৎ দেবনাথের কথা মনে পড়ায় আমার বেশ রাগ হলো। বন্ধুদের মধ্যে দেবনাথকেই সবচেয়ে সুন্দর বলা যায়। কোঁকড়ানো চুল, ধারালো নাক ও ঠোঁট, ঝকঝকে চামড়া, সব কিছুর সঙ্গে দামী কাচের গ্লাসের মিল আছে, ঐ রকম সুন্দর মুখ নিয়ে এখনদেবনাথ খবরের কাগজের অফিসে যুদ্ধের ইংরেজি খবরের বাংলা অনুবাদ করছে। অন্তত আজ বিকেলে ঐ কাজের জন্য দেবনাথের অমন সুন্দর মুখের কোনো দরকার ছিল না। আমার ছিল।

চৌরঙ্গীর ওপর, লিণ্ডসে স্ট্রীট ছাড়ালে বাইবেল সোসাইটির বাড়ি—যেখানে একটা কাচের বাক্সের মধ্যে একটি বাইবেল খোলা অবস্থায় রাখা থাকে—প্রতিদিন কে বা কারা তার একটি করে পাতা উল্টে দেয়, সেই বাড়ির বারান্দার নিচে গায়ত্রী এসে দাঁড়াবে ঠিক ছ-টার সময়। আমি একটু আগেই বেরিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গায়ত্রী কোনোদিন আসে না, সুতরাং ওখানে আমাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবেই—তাই বাসে ওঠার আগে আমি আর একটা সিগারেট ধরালাম। সেই আমার প্রথম ভুল। ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে যারা মরে, তাদের অনেকেরই বোধহয় আগের ট্রেনে যাবার কথা থাকে।

সিগারেটটা মুখে রেখে দেশলাই জ্বেলেছি, কে যেন ফুঁ দিয়ে সেটা নিবিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি কেউ না। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠেছে, পাক দিয়ে ঘুরছে ধুলো। চোখ আড়াল করলুম আমি ধুলো আটকাবার জন্য। বিকেলবেলা এ রকম হাওয়া ওঠা ভালো নয়, বিকেলটা না নষ্ট করে দেয়। কিছুতেই সুযোগ হয় না, গায়ত্রী অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারে না, লুকিয়ে দেখা করতে হয়। আজ দেড় মাস পরে, আমি গায়ত্রীকে সান্ত্বনা দেবো এবং সান্ত্বনা চাইবো। একটু পরেই চোখ খুলে দেখি, সেই ঘূর্ণী ঝড়টা উঠে গেছে শূন্যে, রাস্তা আবার আগের

মতন শান্ত এবং রাস্তার উল্টো দিক থেকে আমারই জন্য একজন হেঁটে আসছে। সিগারেটটা ধরিয়েই আবার ফেলে দিতে হলো, কেননা, বাবার বন্ধু প্রতাপ কাকা। প্রতাপ কাকা বললেন, রাস্তার ওপার থেকে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলুম, তুই দেখতে পাসনি সন্তু?

আমি বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললুম, না তো, আপনি আমাকে ডাকছিলেন?

—হ্যাঁ, তোদের বাড়িতে আমাকে যেতে হতো—ভালোই হলো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোর মা-কে বলিস্…কপালের ওপর তোর ওটা কি হয়েছে? অতবড় ফোঁড়া?

—ফোঁড়া না ব্রণ, এমন কিছু নয়—

—না, না, কপালের ওপর ওরকম প্রকাণ্ড একটা, শোন্, আঙুলে রুমাল পেঁচিয়ে তারপর টিপে দে এমনি করে—

—না, না, প্রতাপ কাকা বিষম ব্যথা—

—আচ্ছা শোন, তোর মাকে বলিস

প্রতাপ-কাকা যতক্ষণ কথা বললেন, ততক্ষণে বাস চলে গেল বেশ ফাঁকা ফাঁকা। তখন বুঝতে পারিনি—সেই দুটি বাসই আমার সমস্ত সৌভাগ্য নিঃশেষ করে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ দুটোর যে কোনো একটায় উঠলে—।

তৃতীয় বাসে বেশ ভিড়, কিন্তু না উঠে উপায় নেই—এরপর দেরী হয়ে যাবে। পা-দানিতে সিঁড়ির কাছে। একজন পাঞ্জাবী গোয়ালা সিঁড়ির নিচে দুধের বালতিটা রেখে আমার পাশে। সম্রাটের মতন তার দাড়িময় মুখের সৌষ্ঠব। কিন্তু গায় খুব বদগন্ধ। দুটি মেয়ে নেমে যাবার আগে আমার দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকায়। বস্তুত ওরা আমার ব্রণের জন্যই তাকিয়েছিল, কিন্তু ওদের সেই চাহনিই আমাকে ব্রণের কথা ভোলাবার পক্ষে যথেষ্ট এবং আমাকে অমনোযোগী করে। কিছুক্ষণের জন্য গাম্ভীর

কোথাও আমার মনে থাকে না। সেই অবসরকালে, কণ্ডাক্টর টিকিট চাইতে এলে, আমার তো পয়সা হাতেই ছিল, অন্যমনস্কহাত দেওয়া-নেওয়া সেরে নেয়, পাঞ্জাবী গয়লাটি কোমরের গেঁজের গিঁট খোলার চেষ্টা করে। হয়তো অসতর্ক মুহূর্তে আমি মুখ ঘুরিয়ে ছিলাম, কিংবা তার হাত পিছলে গিয়েছিল। অব্যর্থভাবেগয়লাটির কনুই আমার কপালে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ প্রথমেই আমার মনে হলো আমি অন্ধ হয়ে গেছি—এমনই তীব্র যন্ত্রণা, এর থেকে বেশী শারীরিক যন্ত্রণা আমি আগে কখনো পাইনি। অস্পষ্টভাবে কানে এলো, মাফ কিজিয়ে, নেই দেখা, বিলকুল…খুন গিরতা। মনের মধ্যে বিদ্যুৎভাবে খেলে গেল গয়লার ময়লাসঙ্গী হাত, কতরকম বীজাণু, সেপটিক, ইরিসিপ্লাস, অরুণেশ দাস মজুমদার। কপালে রুমাল চেপে আমি বাস থেকে নেমে পড়লুম।

ব্যথা একটু কমতেই, চিন্তা স্বাভাবিক হয়ে আসে, মনে হয়, মৃত্যু অত সোজা নয়। এখন চাই একটা আয়না, কপালের ক্ষত কতখানি। সিগারেট কেনার জন্য এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে পানের দোকানের মহাভারতের ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারের পাশের ঝাপসা আয়নার সামনে আমার মুখ। একেবারে থেঁৎলে গেছে ব্রণটা, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। এক একটা ব্রণ এই রকম অভিমানী —অসময় ফাটালে কিছুতেই রক্তস্রোত বন্ধ করতে চায় না। পানওয়ালা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাবু, ধূপকাঠি কিনবেন? আমার কাছে ভালো ধূপকাঠি আছে—

আমি ধরা গলায় বললুম, না, না—

—খুব ভালো গন্ধ। রিফুজি মেয়েদের তৈরী করা, দু' প্যাকেট নিন, সাত আনায় হবে—

—না, না,

—গরীব মেয়েগুলো রোজগারের চেষ্টা করছে একটু সাহায্য করুন—

আমি কাতরভাবে তাকে জানালুম, না ভাই আমি ধূপকাঠি নেব না। এখানে ডাক্তারখানা কোথায় বলতে পার ?

—ও কিছু না, একটু চুন লাগিয়ে নিন—

—না, চুন লাগাবো না—ডাক্তারখানা—

লোকটি নির্লিপ্তের মতন জানালো, কি জানি, ডাক্তারখানা কোথায়।

কী নিষ্ঠুর লোকটা! এই কি আমার ধূপকাঠি কেনার সময়! আমি ধূপকাঠি কিনি নি বলে আমাকে ও ডাক্তারখানা দেখাবে না রাস্তাটার দু'ধারে শুধু পোশাক আর মনোহারী জিনিসের দোকানই চোখে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান একটা কোথাও থাকবেই লুকিয়ে।

কাপড়ের দোকানের সিঁড়িতে এক ধাপ উঠে এতক্ষণে আমার গায়ত্রীর কথা আবার মনে পড়ে। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে থাকবে। সুতরাং গলায় সোনার চেন-পরা মলমলের পাঞ্জাবী গায়ে লোকটিকে ডাক্তারের কথা জিজ্ঞেস করার আগে আমি প্রশ্ন করলাম, এখন কটা বাজে ?

লোকটি আঁৎকে উঠে বললো, এ কি, আপনার সারা মুখে রক্ত! মাথা ফেটে গেছে বুঝি ? ওরকম রুমাল চেপে দাঁড়িয়ে আছেন ? হাসপাতালে যান। ট্যাক্সি ডেকে দেব ?

অবিচলিতভাবে পুনরায় আমার প্রশ্ন, এখন কটা বাজে ?

—এমারজেন্সি সব সময় খোলা। কি করে ফাটলো ?

—কটা বাজে আগে বলুন ?

—সাড়ে পাঁচটা।

—আপনার ঘড়ি ঠিক আছে? শ্লো নয় তো ?

লোকটি গলা ছেড়ে কাকে ডাকলো, হেরম্ব, এদিকে এসো তো একবার—বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এসো!

এখনও সময় আছে। ব্যথার জন্য মনে হয়েছিল অনেক সময়

কেটে গেছে। বললুম, আমার বিশেষ কিছু হয়নি, একটা ফোঁড়া ফেটে···এখানে ওষুধের দোকান কিংবা ডাক্তারখানা আছে?

—বাঁ-দিকে চলে যান, পাঁচ সাতখানা বাড়ির পরে একজন ডাক্তার থাকেন। এঃ হে, মেঝেতে রক্ত পড়লো, হেরম্ব জল নিয়ে এসো—বললুম না—বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে এক্ষুনি একবার এদিকে এসো—

কপাল থেকে রুমালটা সরাতেই রক্ত আবার গলগল করে বেরুতে চায়। পুনরায় রুমাল চাপা। কাপড়ের দোকানের মেঝেতে পাতা দু'ফোঁটা রক্ত। যাক্ ছটা বাজতে এখনো দেরী।

পাঁচখানাও না, সাতখানাও না, আমি গুনতে গুনতে আসছিলাম ঠিক একুশখানা বাড়ির পর এক বাড়িতে এক ডাক্তারের নেমপ্লেট। বেল টিপতেই আর্দালি। আসুন ভেতরে। এখানে একটু বসুন। আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে। আর্দালি সুইং দরজা ঠেলে অপর কক্ষে ঢুকে গেল, তখুনি বেরিয়ে এলে বললো, আসুন।

## দুই

টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ডাক্তারটি কোনো বই পড়ছিলেন। চোখ তুলে আমাকে দেখেই বললেন, কি? স্ট্যাবিং?

আমি বিনীতভাবে বললুম, না, হঠাৎ একটা ব্রণ ফেটে গেছে—

বিনীত, কেননা, এর আগের মুহূর্তেও ডাক্তারের ফি-র কথা মনে পড়েনি। আমার দরকার শুধু অ্যান্টিসেপটিক মলম—কিন্তু এই ডাক্তারের সময় নষ্ট করার জন্য যদি। কত? আট, ষোলো, বত্রিশ। পকেটে তিন টাকা। ঘরখানায় আলো খুব জোরালো নয়, এত বেশী চামড়া বাঁধানো বই যে ডাক্তারের বদলে উকিলের ঘর বলে ভুল হয়। আরও চোখে পড়ে, তিনদিকের দেয়ালে প্রায় পনেরো-ষোলোটা টিকটিকি বেশ কেঁদো সাইজের।

ডাক্তার এবার বেশ ধীরে সুস্থে তিনটে ড্রয়ার খুঁজে একটা মলমের টিউব বার করলেন। সেটা হাতে রেখেই একটা আলমারি খুললেন। আলমারি ভর্তি থাকে থাকে সাজানো কাচের স্লাইড। অন্তত হাজার দুয়েক। তার থেকে একটা স্লাইড নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে। কাছে আসার পর আমার মনে হলো, এই ডাক্তারকে আমি আগে কোথাও দেখেছি। কোথায়? মনে নেই। হুকুমের সুরে তিনি বললেন, রুমাল সরান। কাচের স্লাইডে তিনি আমার কপাল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিলেন। তারপর রক্তটার দিকে নির্ণিমেশে চেয়ে রইলেন। যেন ওঁর খুব দুঃখ। এইভাবে মানুষ কখনো কখনো প্রথম দেখা নদীর দিকে তাকায়। ডাক্তারের হাতের কব্জীর ঘড়িতে দেখে নিলাম—পাঁচটা চল্লিশ, আর বেশী সময় নেই। বাসে এখান থেকে পনেরো মিনিট লাগবেই মেরে কেটে। আমি অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। খালি চোখে রক্তে আবার কে কি দেখতে পায়। ভড়ং! ফি-তো দিচ্ছি না! এই ডাক্তারকে আগে কোথায় দেখেছি? ডাক্তার এবার মুখ ফিরিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে আবার হুকুম, আঙুল দেখি!

আঙুলগুলো ছড়িয়ে হাতের পাঞ্জাটা এগিয়ে দিলাম। ডাক্তার টিউব টিপে এখটুখানি মলম আমার তর্জনীতে লাগিয়ে ডানদিকের একটা হেলানো চেয়ার দেখিয়ে বললেন, যান, ঐখানে বসে কপালে মলমটা লাগান।

চেয়ারে বসার কোনো ইচ্ছেই নেই। আমার সময় নেই, অতএব আরও বিনীত, বিগলিত হাস্যময় মুখ, না, আমি আর বসবো না, আমাকে এক্ষুনি একটা কাজে যেতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, মানে একটাও ওষুধের দোকান নেই কাছাকাছি, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হলো, মলমটা—

—বসুন ঐ চেয়ারে!

অবাক্। হুকুম? কেন, কি এমন ব্যাপার হয়েছে? ভারী

তো একটু মলম, এ ডাক্তারের কাছে তেমন পেসেণ্টও তো আসে না। রথীনের মামার চেম্বারে দেখেছি সব সময় কানা খোঁড়ায় গিসগিস করে। বসলুম না, দাঁড়িয়েই রইলুম। ডাক্তার চলে গেছেন টেবিলের ডান পাশে, মাইক্রোসকোপের নিচে আমার রক্তমাখা স্লাইড, মাইক্রোসকোপের ওপরে ডাক্তারের মনোযোগী চোখ। চোখ না তুললে কথা বলতে পারছি না। এবারের কথাটা ডাক্তারের চোখের দিকে চোখ রেখে নির্ভীকভাবে বলতে হবে। উপকার করেছেন ঠিকই কিন্তু এমন কিছু নয়, যার জন্যে আপনার হুকুম শুনতে হবে! এর জন্য ফি আশা করাও আপনার অন্যায়।

নাকের কাছটা হঠাৎ ভিজে ভিজে লাগলো। একটা ফোঁটা টলটল করছে। হঠাৎ সর্দি হয়ে গেল? ছিটেফোঁটাও তো ছিল না সকালে? আঙুল ছোঁয়ালুম। আঙুলের ডগা রক্ত মেখে ফিরে এলো। এখনও রক্ত। এবারে আঙুল গেল কপালে, খুব সাবধানে ছুঁল। ভিজে ভিজে। মলম লাগিয়েও রক্ত বন্ধ হয়নি। রুমালটায় ছাপ ছাপ রক্ত। আমার হাতে। তাহলে নিশ্চিত মুখেও। ভালো করে না ধুয়ে তো আর যাওয়া যাবে না। এক একটা ব্রণ এ রকম তেরিয়া ধরনের হয়, কপালের ব্রণ তো কোনো নিয়মই মানে না। অনেক ডাক্তারের ঘরে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন থাকে। এর নেই। আয়নাও নেই। এই প্রথম আমার মন খারাপ লাগলো। গায়ত্রীর কাছে এরকম রক্তমাখা হাত আর মুখ নিয়ে কুৎসিত ভাবে কি করে যাবো? আর কপালের রক্তপাত বন্ধ করতেই হবে।

ডাক্তার মাইক্রোসকোপে তন্ময়। আমি ক্রমশ অধৈর্য। মলমের টিউবটা কোথায় গেল? আমি একটু জোরে বললুম, মলমটা আর একটু দেবেন? আমার রক্ত বন্ধ হয়নি। মাইক্রোসকোপ থেকে চোখ উঠলো না, উত্তর এলো, বেশী মলম লাগালে বেশী কাজ হয় কে বলেছে?

—কিন্তু আমার রক্ত পড়া তো বন্ধ করতে হবে।

—বললুম তো, ঐ চেয়ারটায় বসুন !

ঘরের ভেতর দিকে আর একটা দরজা আছে, আগে লক্ষ্য করিনি। খোলার পর চোখে পড়লো। খোলা দরজায় একটি মেয়ের শরীরের এক অংশ দাঁড়ালো। মুখ ঝুঁকলো ঘরের মধ্যে, কোঁকড়া চুল চিবুক দেখলে উনিশ বছরের বেশী বয়েস মনে হয় না। ভারী চমৎকার দাঁত,সেই দাঁতের ঝিলিকে প্রশ্ন, বাবা তুমি এখন চা খাবে ?

—না।

—খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

—এখন না একটু পরে।

মেয়েটিকে দেখেই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। রক্ত মেখে আমার কপালের চেহারাটা এখন কি রকম হয়ে আছে কে জানে। কিন্তু মেয়েটি ঘরের দ্বিতীয় প্রাণীর উপস্থিতি ভ্রূক্ষেপই করলো না। সম্পূর্ণ শরীরটা নিয়ে ঘরে এলো, দোহারা চেহারা, তুতে রঙের শাড়ি, আমি আড়চোখে দেখছি, সে টেবিল থেকে দুটো আলপিন তুলে নিয়ে আবার পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল।

ডাক্তার চোখ তুলে সাড়ম্বরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মুখখানা কিন্তু সত্যিকারের বিষাদময়। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, জানতুম ! আমি আগেই জানতুম।

আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এতক্ষণ ধরে জামার রক্তে কি দেখছিলেন ! কি হয়েছে আমার ? রক্ত পড়া থামছে না কেন ? নাঃ, এসব বাজে ভয়। 'জানতুম'। কি জানতেন ? দরকার নেই জেনে। মলমটা বিনা পয়সায় হলেও রক্ত পরীক্ষার জন্য ফি দিতেই হয়।

—দেখুন আমার রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না। দয়া করে এর একটা ব্যবস্থা করবেন ?

—ঐ রক্ত শরীরে থেকেই বা লাভ কি ? যতটা বেরিয়ে যায় যাক।

—তার মানে? আমি রাস্তা দিয়ে এভাবে যাবো কি করে?

—যেতে হবে না। সেইজন্যই তো ঐ চেয়ারে বসতে বললুম।

—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে যে—

—কোথায় যাবেন?

অচেনা লোককে কেউ এ প্রশ্ন করে না। ডাক্তারটা আসল তো, নাকি কোনো পাগল? একটা ব্রণ ফাটার রক্তও তো বন্ধ করতে পারে না। জলের ঝাপটা দিতে পারলে বরং।

—আমার রক্তে কি দেখলেন?

—আমার এই ক্যাবিনেটে সাড়ে সাতশো রক্তের স্লাইড আছে। ওর সব কটাতে যা দেখেছি, আপনারটাও তাই। দূষিত, পচা রক্ত।

—অসম্ভব, আমার কোনো অসুখ নেই।

—আসল অসুখটাই বাধিয়ে বসে আছেন। ঐ সাড়ে সাতশো —প্রত্যেকেরই বয়েস তিরিশের নীচে—সকলেরই এক রোগ।

অস্বীকার করতে পারবো না, তায় বুকটা ছমছম করছে। অজান্তে কোনো মারাত্মক অসুখ শরীরে দানা বেঁধেছে? কখনো তো টের পাইনি। হঠাৎ একদিন মূল ধরে নাড়া দেবে? মরে যাবো? মৃত্যুর কথা ভাবলে বুক মোচড়ায়। না, মরতে চাই না। একটুও মরতে ইচ্ছে হয় না।

পূর্ব নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আমার শরীর। মুখ প্রশ্ন করে, কি অসুখ?

—এক্ষুনি যেতে হবে বলছিলেন যে?

—অসুখটা কি বলুন? পরে এসে আপনার কাছে চিকিৎসার ব্যাপার…

—কি নাম?

—সনৎ দাশগুপ্ত।

—বয়েস?

—সাতাশ।

—অসুখটার নাম কাপুরুষতা।

ডাক্তারের ঠিক দু'চোখের ওপর আমার দু'চোখ। দেখা হয়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই বাতিকগ্রস্ত। কিংবা আদর্শবাদী-টাদী কিছু একটা হবে। গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললুম, আচ্ছা চলি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো, রক্তটা ধুতে হবে। কপালে, নাকে, হাতে। এইরকম ভাবে রাস্তায়—। ডাক্তারও উঠে দাঁড়িয়েছেন, প্রায় হুংকারের মত বললেন, অস্বীকার করতে পারবেন, কাপুরুষতার কথা। আমার বয়েস সাতচল্লিশ, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার সাহস আছে?

পাঞ্জা লড়ার ভঙ্গিতে নিজের কব্জি মুচড়ে দিলেন তিনি, ঘড়িটা একেবারে আমার চোখের সামনে। ছটা বাজতে পাঁচ। আঃ, কেন তিনটে বাস ছেড়েছিলাম। কেন প্রতাপ কাকা। কেন গয়লাটার কনুই। এখনও ট্যাক্সি নিতে পারলে—। চঞ্চল হয়ে বললুম, দেখুন, আজ আমায় এক্ষুনি যেতে হবে, পরে আর একদিন এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। এখন একটু যদি—

—এক হাত পাঞ্জা লড়ারও সাহস নেই?

—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। যদি একটু।

—কতক্ষণ আর লাগবে? এক মিনিট।

—কিছুতেই আর পারবো না! যদি একটু জল—

—কোথায় যেতে হবে?

—একটি মেয়ে ছটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবে, ভীষণ দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু রক্তটা বন্ধ হলো না—

—মেয়েটির সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

পিছনের দরজা ঠেলে আবার সেই মেয়েটি। সেই তুঁতে রঙা শাড়ি, দোহারা উনিশ। এবারও ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করা গলায়, বাবা, তোমাকে মা ডাকছে।

—এখন না, একটু পরে।

—খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

এবার মেয়েটি আমার দিকে ফিরে, আপনি একটু বসুন, বাবা এক্ষুনি ঘুরে আসছেন। হঠাৎ আশা পেয়ে আমি মেয়েটিকে অনুনয় করি, দেখুন, আপনার বাবার সঙ্গে আমার আর কোনো দরকার নেই, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কোনো বাথরুম আছে? আমি একটু মুখটা ধুতাম।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললেন, তার আগে একটা কথার উত্তর দিন। মেয়েটির সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

—আট ন বছর।

—নিশ্চয়ই মেয়েটি বিবাহিতা?

—না, না,

—আবার মিথ্যে কথা? কাপুরুষ, কাপুরুষ! চোখের পাতা ফেলা দেখে বুঝতে পারছি মিথ্যে কথা।

আমি মেয়েটিকে সনির্বন্ধ অনুরোধে, বাথরুমটা যদি দেখিয়ে দেন।

—একতলার বাথরুম তো বন্ধ। পিসীমা গেছেন। দোতলায় আসুন।

—না, না, থাক, দোতলায় না। যদি একটু জল।

—শুধু জল চাই? বাইরে তো বৃষ্টি পড়ছে, তাতে ধুয়ে নিন না।

—বৃষ্টি পড়ছে?

—খুব জোরে। বেরুলেই ভিজে যাবেন।

—তা হোক, আমি চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ডাক্তার তাঁর মেয়েকে বললেন, রিস্টু, ঐ লোকটার অসুখ কোনোদিন সারবে না।—আমি আর ডাক্তারের কথায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে এলাম সুইং ডোর ঠেলে। বসবার ঘর পেরিয়ে। বাইরে সত্যিই বৃষ্টি।

কিছুক্ষণ আগে যে ঘূর্ণী হাওয়া উঠেছিল, তারই অনুসরণকারী এই বৃষ্টি। বেশ ঝেঁপে এসেছে। আমি ভিজতে ভিজতে রাস্তার মাঝখানে। দু'হাত পেতে জল নিয়ে হাত দুটো রগড়ে নিলাম। আকাশের দিকে মুখ রাখতেই কিছুক্ষণ সচ্ছলভাবে জলবর্ষণ হলো, ব্রণ-থ্যাৎলানো জায়গাটা জ্বালা করে উঠলো। একটা ট্যাক্সির জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল।

## তিন

অফিস ছুটির পর যে রাস্তাঘাট মানুষে ছেয়ে যায়, সে সব মানুষ এখন কোথায়? খাঁ খাঁ করছে চৌরঙ্গি। জলে ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া গাড়ির চিটচিটে শব্দ। অন্য দু' একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে কিছু লোক জমে আছে, কিন্তু বাইবেল সোসাইটির বাড়ির বারান্দার নীচেটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। কেউ নেই। সাড়ে ছ'টা বাজে। গায়ত্রী এসে চলে গেছে? এই বৃষ্টির মধ্যে গেল কি করে? বুকের মধ্যে একটা বিষম উত্তেজনা। কোনোদিন গায়ত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করিনি। কিন্তু আজ গায়ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিতে বললাম।

ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গায়ত্রী হাঁটছে। বসন্তকালের আকস্মিক বৃষ্টি, কেউ ছাতা বা বর্ষাতি নিয়ে বেরোয়নি, সুতরাং পথে লোক নেই। গায়ত্রী একা হাঁটছে ভিজতে ভিজতে—মিউজিয়ামের পাশের প্রশস্ত ফুটপাথে। মন্থর অভিমানী তার পদক্ষেপ। কষ্ট হলো, গায়ত্রী আমাকে ভুল ভেবেছে। বৃষ্টির ভয়ে আমি আসিনি! তাই ও ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজছে। ট্যাক্সিওলা, রোখকে! গায়ত্রী!

দরজা খুলে আমি অতি ব্যস্ততায় নেমে পড়েছি। এবার সে ঘুরে তাকালো। গায়ত্রী নয়। লম্বাটে ধরনের মুখ, অতিরিক্ত

ফর্সা, কিন্তু সেই মুখ বিষণ্ণ ছিল। অন্য মেয়ে, কিন্তু একটু একটু চেনা মনে হলো। ডাক্তারটিকেও একটু চেনা মনে হয়েছিল, কোথাও যেন আগে দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারিনি। এরও নাম মনে এলো না। কিন্তু মেয়েটি আমাকে চিনতে পেরে বললো, সনৎবাবু? আপনি কোন্‌দিকে যাচ্ছেন? আমাকে একটু বেকবাগানের মোড়ে পেঁছে দেবেন? একটাও ট্যাক্সি পাচ্ছি না—সাড়ে ছ'টার মধ্যে পেঁছুবার কথা।

আমি খিদিরপুরের জন্য রওনা হয়েছিলাম, বেকবাগান অন্যদিকে। কিন্তু না বলা যায় না। আসুন। সংকুচিতভাবে আমি সরে বসলাম। মেয়েটি হাতব্যাগের মধ্য থেকে শুকনো রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হলো। সাড়ে ছটা এখানেই বেজে গেছে।

আমার একমাত্র সৌভাগ্য, আমি একটা ট্যাক্সি অধিকার করতে পেরেছি—মেয়েটিকে তার ভাগ দিতে হবে। কিন্তু কেএই মেয়েটি? বেকবাগানের দিকে দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির দশ মিনিটের মধ্যে মেয়েটির কাছ থেকে—আমার যে ওর নাম মনে নেই সে কথা বুঝতে না দিয়ে, ওর নাম কি করে জানা যায়? জিজ্ঞেস করি, গায়ত্রীর সঙ্গে আপনার দু'চারদিনের মধ্যে দেখা হয়েছিল?

—কে গায়ত্রী?

—গায়ত্রীকে চেনেন না? গায়ত্রী সান্যাল?

—না তো!

—আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

—ও মা, আপনি বুঝি আমায় চিনতে পারেন নি?

—না।

—তাহলে একটা অচেনা মেয়েকে ট্যাক্সিতে তুললেন কেন?

—আপনি তো আমার নাম ধরে ডাকলেন।

—শুধু সেইজন্যই? আপনি কোন্‌দিকে যাচ্ছিলেন?

—খিদিরপুর।

—তাহলে বেকবাগানে যাচ্ছেন কেন?

- তাতে কি হয়েছে, আপনাকে পেঁছে দিচ্ছি।

—না, আমি যাবো না, আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।

—আরে না, না, তা কি হয়! চলুন না, বেকবাগান আ কতদূরে।

—না, আমি কিছুতেই যাবো না। আপনি আমার না জানেন না?

—আপনি কি করে জানলেন যে আমার নাম সনৎ?

—সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। ট্যাক্সি এখানে বেঁ দিন।

আরে একি করছেন! চলুন না, এইটুকু তো, পেঁছে দেওয়া

মেয়েটি দরজা খুলতে গেলে, আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বাং দেবার চেষ্টা করি। মেয়েটি হিংস্রভাবে মুখ ঘুরিয়ে, আপি আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন যে? লজ্জা করে না? একটা অচেন মেয়ের…

—আরে ছি, ছি, তা নয়। আমি আপনাকে পেঁছে দি চাইছিলাম।

একটা অচেনা মেয়েকে পেঁছে দেওয়ার অত গরজ কিসে আপনার?

—অচেনা কোথায়? আপনি তো আমাকে চেনেন।

—দু'জনে দু'জনকে না চিনলে চেনা হয় না। আপনি হাত সরান, আমি নেমে যাই। আমাকে অপমান করতে চাইছে আপনি।

আমার হাসিও পাচ্ছিল, আবার বুকের মধ্যে একটু কান্না কান্ন ভাব। এই এক ধরনের অভিমান। ধৈর্য্য শেষ হয়ে গিয়েছিল মেয়েটিকে আমি নেমে যেতে দিলাম। নেমে গিয়েমেয়েটি ব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। কথা বলতে

গেলেই কথা বাড়বে। মেয়েটি তিক্ত গলায় বললো, এই নিন্ এই রাস্তাটুকুর ভাড়া। আমি হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, চালিয়ে। মেয়েটি এবার একটু হাসলো, বললো আপনার কপাল কেটে গেছে বোধহয়। রক্ত পড়ছে মুছে ফেলুন।

## চার

দূর থেকে দেখেছি, এ-বাড়িতে কোনোদিন ঢুকিনি। দরজা ধাক্কা দিতে সুব্রতদা নিজেই খুললেন। আমাকে দেখে মুখে চোখে হাসি, বললেন, আরে সন্তু, কি ব্যাপার, এসো, এসো, ভাবতেই পারিনি—কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। ইস্, একেবারে ভিজে গেছ যে—তোয়ালে দিচ্ছি, মুখটুখ মুছে নাও!

সাদা তোয়ালের মাঝে মাঝে লাল ছাপ পড়তে লাগলো। ইস্, কি বিরক্তিকর! সুব্রতদা কোনো ভনিতা করলেন না, পুলকের ছোঁয়া লাগা মুখেই বললেন, গায়ত্রীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছো তো? কিন্তু সে কি আর তোমার সঙ্গে আজ দেখা করবে? যা রাগ করে বসে আছে সারাদিন!

- কেন, রাগ করেছে কেন?

—কি জানি। সন্ধেবেলা বেরুবে বলেছিল, আমি এত বললুম, কিছুতেই আর বেরুলো না। সকালবেলা খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে তো!

—কি নিয়ে ঝগড়া?

সুব্রতদা সস্নেহে আমার কাঁধে দু' হাত রেখে বললেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয়, তা কিজিজ্ঞেসকরতেআছে ভাই?

—সুব্রতদা, আপনি ওকে আবার মেরেছেন?

—ছিঃ, ওসব কথা জিজ্ঞেস করে না!

কাঁধ থেকে সুব্রতদারহাত সরিয়ে আমি একটুদূরেদাঁড়ালাম।

চোয়াল কঠিন। বললাম, সুব্রতদা, আপনি জঘন্যভাবে অসভ্যের মতন গায়ত্রীর ওপর অত্যাচার করেন, আমি সব জানি। এর একটা শেষ হওয়া দরকার।

—সব শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না।

-তার মানে ?

—গায়ত্রী আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করবে না, আমাকে কথা দিয়েছে।

—আমার সঙ্গে দেখা করাটা কোনো ব্যাপার নয়। বিয়ের পর দেড় বছর আমরা একদিনও দেখা করিনি। কিন্তু আপনি পশুর মতন···সুব্রতদা, আপনি গায়ত্রীকে জোর করে বিয়ে করেছিলেন কেন ?

—নিজে কষ্ট পাবার জন্য। এই ছ' বছরে আমার জীবনটা তো জ্বলে পুড়ে গেল !

—গায়ত্রী আপনার সঙ্গে গোড়ার দিকে অনেক মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। গায়ত্রীর মত ভালো মেয়ে—

সুব্রতদা পরম আহ্লাদ পেয়ে হাসার মতন মুখ করে বললেন, কিন্তু তার যে একটা উকিল ছিল তোমার মতন –

—আমি কি করেছি ?

—তুমি আর কি করবে ? তুমি কিছুই করোনি, তোমার কিছু করার সাধ্যও নেই, তুমি শুধু শখের প্রেমিক সেজে থেকেছো। গায়ত্রীর মাথাটা তাতেই বিগড়েছে।

—সুব্রতদা, আমি গায়ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবো ওপরে।

—খুব ভালো কথা। তার আগে একটা কথা শুনবে ভাই ? মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। গায়ত্রীর সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে। সে আর আমার অবাধ্য হবে না। তুমি আর মাঝখান থেকে উৎপাত করতে এসো না। ডাক্তার এসে বলে গেছেন, গায়ত্রীর বাচ্চা হবে। চারমাস চলছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াই। এইজন্যই সুব্রতদার সারা শরীর ভরা খুশী। পুনশ্চ আমার কাঁধে বন্ধুর মতন সুব্রতদার হাত। ফিস ফিস করে বললেন, বিয়ে তো করোনি, এসব বুঝবে না। আমি বরাবরই গায়ত্রীকে বলেছিলাম, আমার দিক থেকে কোন দোষ নেই ডাক্তাব বলেছেন –

—আপনি সত্যি বলছেন ?

এ প্রশ্নটা বলার জনাই বলা। সুব্রতদার চোখ ঝিকঝিকে, লম্পট পাষণ্ডটা আমাব দিকে তাকিয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতন তাকিয়ে বললো, এ-সব কথা কেউ মিথ্যে বলে ? একটা সিগারেট দাও তো। আছে ?

দোতলা বাড়িটার কোথাও কোন শব্দ নেই। চাকর-টাকরও কারুকে দেখা যাচ্ছে না। সুব্রতদার কানের কাছে একটুখানি সাবানের ফেনা। এইমাত্র দাড়ি কামিয়েছেন।

—নেই, সিগারেট নেই।

—যাক্‌গে, তুমি তাহলে ওপরে যাবে গায়ত্রীর কাছে ? ভেবে দ্যাখো, সে এখন মা হতে যাচ্ছে—এখন কি আর তোমাদের ওসব ছেলেমানুষী মানায় ?

—শুধু একবার দেখা করবো –

চলো। সুব্রতদা আমার হাত ধরে সিঁড়ির কাছে এলেন। দু-ধাপ উঠে আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলবে ওকে ?

—জানি না।

—আর কোনোদিন আসবে না বলো ?

—ও যদি না চায়, ও যদি বারণ করে···

—ও কি বোঝে ? তোমাতে আমাতে কথা হচ্ছে—পুরুষ মানুষের ব্যাপার, মেয়েরা এসবের কি বোঝে ?

—সুব্রতদা আমাকে একবার ওপরে যেতে দিন।

আরও কয়েক ধাপ উঠে সুব্রতদা আবার দাঁড়ালেন। কি যেন

উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। মুখটা একটু বদলে গেল। খরগোশের মতন চোখ। তারপর আবার হাসলেন -ও কিছু না। সন্তু একটা কথা সত্যি করে বলো তো ? তুমি কোনোদিন গায়ত্রীর সঙ্গে······

—ছাড়ুন, ছাড়ুন আমাকে ঠেসে ধরছেন কেন ?

– সন্তু তোমাকে যদি এই সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিই ?

—কেন, আমি কি করেছি ?

—তুমি কিছু করনি। সেইটেই তো তোমার দোষ। তুমি একটি ন্যাকা—

—আমার কাঁধ ছাড়ুন ! ভাল হবে না বলছি !

—ইয়ার্কি করছি, তাও বোঝো না ? তোমার কপালে রক্ত কেন ? ব্রণ ফাটিয়েছো তুমি ? দেখি, দেখি—

—খবরদার, আপনি আমার কপালে হাত দেবেন না। না, বলছি—

—হাত দেবো কেন ? রক্ত ছুঁতে আমার ঘেন্না করে। দেখছিলাম—

নীচের দরজায় শব্দ হলো। সুব্রতদা আবার উৎকীর্ণ, সারা বাড়ির স্তব্ধতা ফাটিয়ে বিকট গলার চিৎকার করে উঠলেন, কে ? কে ? দরজায় আবার শব্দ। আমাকে ছেড়ে বিদ্যুতের গতি, সুব্রতদা লাফিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে ছুটলেন। পিছনে পিছনে আমিও। দরজার সামনে গায়ত্রী দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ ভিজে, নতমুখ, চুল থেকে টপটপ করে জল গড়াচ্ছে। সিঁথির সিঁদুর গলে একটুখানি গড়িয়ে এসেছে নীচে। অনেকটা আমারই মতন রক্তাক্ত কপালের দৃশ্য। দরজায় হাত রেখে গায়ত্রী স্থির চোখে দেখলো দুজনকে। আমার চোখে চোখ রাখলো না। শরীরটা কাঁপছে ওর। আমি গায়ত্রীকে ডাকতে ভয় পেলাম। একদম মরতে ইচ্ছে করে না আমার। আমার খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

পৃথিবীতে যত বিষ, গলায় জল মিশিয়ে সুব্রতদা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তুমি আবার ফিরে এসেছো? লজ্জা করে না? গায়ত্রী আমার দিকে তাকালো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, কাঁদতেই লাগলো, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে- গায়ত্রীর দিকে আমার দু-চোখ। গায়ত্রী চোখ মুছলো, আমাকে দেখলো না, সুব্রতদার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো আমাকে ক্ষমা করো, না ফিরে আমার উপায় নেই, আমাকে ক্ষমা করো।

সকালবেলার দুধটা ও-বাড়ির ঝি এনে দেয়। অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না শুভেন্দুর। আগে রেবা নিজেই যেত, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে বোতল দুটো হাতে নিয়ে ফিরতো। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে রেবা রোজ রোজ দুধের লাইনে দাঁড়াবে—এটাও শুভেন্দুর পছন্দ নয়। অথচ আপত্তি তোলারও উপায় নেই, তাহলেই রেবা ঝংকার দিয়ে উঠবে, অতই যদি তোমার ইয়ে তবে দুটো ঝি-চাকর রেখে দাও না। চা মুখের কাছে ধরে না দিলে তো বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারেন না বাবু!

ও-বাড়ীর সাবিত্রী নিজেই একদিন বলেছিলেন, আমার ঝি তো রোজ যায়ই দুধ আনতে, তোমারটাও সে এনে দেবে, রেবা! ছেলেমেয়েদের সংসার নিয়ে কি রোজ-রোজ সকালে বেরুনো যায়!

শুভেন্দু বেঁচে গেছে, রেবাও খুশী। কিন্তু মাসের পর মাস এরকম উপকার তো নেওয়া যায় না। প্রতিদান হিসাবে শুভেন্দুও কিছু কিছু উপকার করে দেয়। ব্ল্যাকে চাল কিনতে যাবার সময় শুভেন্দু ও-বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে যায়, আপনার চাল লাগবে নাকি বৌদি? আমি তো যাচ্ছিই—। সাবিত্রী খুশী হয়ে বলে ওঠে, খুব ভালো হলো—আমার জন্য আট-দশ কিলো আতপ চাল যদি পান আনবেন তো! আমার খুড়ি-শাশুড়ি এসে দিন পনেরো থাকবেন—আতপ চাল না পেলে মহা বিপদ হবে তখন। একেই ওরা শুচিবাই।

শহরতলির বাজার থেকে নিজেদের জন্য চার কিলো চাল কিনলো শুভেন্দু। বাসেই ফিরতো, কিন্তু সাবিত্রীর দশ কিলো চালের জন্য তাকে রিকশা নিতে হলো। কিন্তু রিকশা ভাড়াটা আর সাবিত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিলো না।

মাঝে মাঝে ও-বাড়ীর বাজারও করে দেয় শুভেন্দু। অজিতের প্রায়ই নাইট ডিউটি থাকে—তখন আর তার বাজার করার সময় থাকে না। একসঙ্গে দু-তিন দিনের বাজার করে রাখে। তাতে টাটকা মাছ খাওয়া হয় না। ডিম দিয়ে চালাতে হয়। ডিম আবার সাবিত্রীর পছন্দ নয়, ঝিকে বাজারেও পাঠাতে পারে না বিশ্বাস করে। বাজারের থলি হাতে শুভেন্দুকে যেতে দেখে একদিন সাবিত্রী জানলা দিয়ে ডেকে বলেছিল, ঠাকুরপো, বাজারে যাচ্ছেন? আমাদের জন্য কিছু টাটকা মাছ পেলে আনবেন তো! টাটকাপোনা পেলে আধ কিলো নিয়ে নেবেন। তারপর থেকে শুভেন্দু নিজেই প্রায়ই জিজ্ঞেস করে যায়।

একটা দেড় কিলোর আস্ত কাতলা মাছ কিনে ফেললো শুভেন্দু। আস্ত মাছ, তখনও কানকো নাড়াচ্ছে। কিন্তু মাসের বাইশ তারিখে এতটা মাছ শুধু নিজের জন্য কেনার বিলাসিতা করার উপায় তার নেই। সাবিত্রীদের জন্য আর অন্য মাছ কিনলো না—ঐটাই দু'জনে ভাগ করে নেবে ঠিক করল। বাজার থেকে ফেরার পথে সাবিত্রীদের বাড়ীই আগে পড়ে—শুভেন্দু অন্যমনস্কভাবে গলি দিয়ে ঘুরে আগে নিজের বাড়ীতেই এলো। রেবাকে বললো, মাছটাকে সমান দু'ভাগ করে দাও, সাবিত্রী বৌদিদের অর্ধেকটা দিয়ে আসি।

মাছ দেখে রেবা খুশী। কিন্তু ভাগ করা এক ঝামেলা। বঁটিটায় ভালো ধার নেই, তাছাড়া ল্যাজা মুড়ো-সুদ্ধু কি আর সমান সমান করা যায়। রেবা খুঁত খুঁত করে। শুভেন্দু উদারভাবে হেসে বলে, সবগুলো টুকরো করে তারপর গুনে গুনে দু' ভাগ করে দাও—অত চুলচেরা হিসেব তোমায় কে করতে বলেছে!

হাতে ছাই মেখে রেবা মাছ কুটতে বসে। মোড়াটা টেনে নিয়ে তার ওপর বসে শুভেন্দু দেখতে থাকে। ঝটপটে তাজা মাছটাকে ধরে রেবা একবারেই মুণ্ডুটা কেটে দেয়, টাটকা লাল রক্ত গড়ায় বঁটিতে—দেখতে শুভেন্দুর বেশ ভালো লাগে।

—মাছের তেলটা কি করবো? তুমি তো তেল-ভাজা খেতে ভালোবাসো—তেলটাও দু'ভাগ করবো? রেবা জিজ্ঞেস করে।

শুভেন্দু দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে, অঙ্ক হিসেব মেলাবার ভঙ্গিতে। তারপর বলে, কাটা মাছ কিনলে, তাতে তো আর তেলটা ওজনে ধরে না। ওটা তুমি আমাদের দিকেই রেখে দাও।

—পেটির মাছগুলো কি করবো? তুমি তো গাদার মাছ পছন্দ করো না।

শুভেন্দু এবার কঠোর বিচারকের মতন জানিয়ে দেয়, না-না, মাছ সব সমান দু'ভাগ করবে—পেটি-গাদা মিলিয়ে—দু'জনেই সমান পয়সা দিচ্ছি তো!

কিন্তু মুড়োটা দু'ভাগ করার সময় ভোঁতা বঁটিতে দুটো টুকরো বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট-বড় হয়ে যায় এবং বড় টুকরোটাই যখন রেবা নিজেদের ভাগে রেখে দেয়—তখন শুভেন্দু আপত্তি করে না, বরং শুভেন্দু গোপনে বেশ খুশীহয়েওঠে। রেবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দু'জনেই গোপন চুক্তির হাসি হাসে।

—দাও, বৌদিদের থলিতে ওদের ভাগটা ভরে দাও।

একই পাড়ায়, একই রাস্তার কিছুটা ব্যবধানে এদিকে-ওদিকে দু'জনের বাড়ী। দু'জনেই ভাড়াটে। একদিন রাস্তায় মুখোমুখি হতে অজিত বলেছিল, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, ঠিক কোথায় দেখেছি আপনাকে?

শুভেন্দুর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর, সে বললো, তোমার নাম তো অজিত, সেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজে নাইনটিন ফিফটিটু—ফিফটি থ্রী।

অজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—কিন্তু তোমার রোল নাম্বার ছিল ফরটি ওয়ান।

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলেছিল, রোল নাম্বার মনে আছে আর নাম মনে নেই? অবশ্য চোদ্দ-পনেরো বছর আগের কথা।

তারপর দুই পরিবারে ভাব হতে দেরি হয়নি। দু'জনেই পরস্পরের বউকে বৌদি ডাকে—বৌদের কাছেও ওরা ঠাকুরপো। একই রকমের চাকরি প্রায়, একই রকমের সংসার। দুটো বাচ্চা হবার পর শুভেন্দু ঝি ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে আর সাবিত্রীর এখনও ছেলেপুলে হয়নি বলে ইনস্টলমেণ্টে স্টীলের আলমারি কিনছে।

মাছের থলিটা নামিয়ে রেখে শুভেন্দু বলে, নিন্ বৌদি, আজ খুব টাটকা মাছ।

থলির মুখটা ফাঁক করে দেখে সাবিত্রী বললো, কি মাছ? কাতলা?

সাবিত্রীর স্বরে খুব একটা উৎসাহ ফুটলো না। রুই ছাড়া আর কিছু সাবিত্রীর ঠিক পছন্দ হয় না। সাবিত্রী আবার বললো, ইস, এ যে অনেকখানি মাছ দেখছি। কতটা আছে?

—সাড়ে সাত শো। বলতে গিয়েশুভেন্দুর হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু জোর করে দুর্বলতা দমন করে সে আবার বললো, সাড়ে সাত শো। মানে দেড় কিলোর মাছটা দু'ভাগ করে।

সাবিত্রী বললে, যাক, ভালোই হয়েছে, আজ আর তা হলে মোচার ঘণ্টটা রাঁধবো না। দুজন তো খাইয়ে—এতখানি মাছ যখন—

শুভেন্দু পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। দাম তার হিসেব করাই আছে—সাড়ে চার টাকা কিলো—তাহলে সাবিত্রীর পড়ে তিন টাকা সাঁইত্রিশ—পাঁচ টাকার নোট থেকে ফেরত পাবে এক টাকা তেষট্টি, কিন্তু হঠাৎ কি ঝোঁক চাপলো, শুভেন্দু পুলকিতভাবে বলে ফেললো আজ খুব সস্তা পেলাম, জানেন! জ্যান্ত কাতলা, তিন টাকা কেজি।

—তিন টাকা? সাবিত্রীর মুখখানা খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

থলের মাছটা মেঝেতে এবার ঢেলে ফেলে সাবিত্রী বললো, এরকম টাটকা মাছ তিন টাকা? এইজন্যেই আমি মানদাকে বাজারে পাঠাতে চাই না। পরশু দিনই তো—পোনা বলে এনেছে, আমি দেখেই বুঝেছি পোনা নয়, কাতলা—তা-ও নাকি পাঁচ টাকা কিলো দু-চার পয়সা চুরি করবি কর, তাই বলে এরকম ডাহা চুরি—

শুভেন্দু উপভোগের হাসি হাসতে হাসতে বললো, একটু-আধটু চুরি না করলে ওদেরই বা চলবে কি করে বলুন?

সাবিত্রীর আকস্মিক খুশী মুখখানা শুভেন্দু চোখভরে দেখে। নিজেকে বেশ একটা কীর্তিমান মনে হয় তার। বাজারে একটা চেনা মাছওলা তাকে কি রকম খাতির করে এবং কোনোদিন পচা মাছ দিতে সাহস করে না—এই ধরনের একটা গল্প শুরু করে এবং গল্পের ফাঁকে বাঁ পকেট থেকে নিজের পয়সা তুলে সাবিত্রীর ফেরত পয়সায় ভরে দিতে তার কোনো গ্লানি হয় না। শুধু একটু খচ্ খচ্ করে, ঝোঁকের মাথায় একেবারে তিন টাকা না বলে সাড়ে তিন টাকা বললেও বোধ হয় হতো। তা হলে সাবিত্রীর খুশী কি এর চেয়ে কম হতো?

—অজিত কি ঘুমোচ্ছে নাকি? কথাটা জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু এদিক-ওদিক তাকায়। তোলা উনুনে কেটলিতে জল ফুটছে।

—না, বাড়ীতে ফেরেনি। নাইট ডিউটির পর কোথায় যেন ঘুরে দেরিতে বাড়ী ফিরবে বলে গেছে।

—তা হলে এখন কেটলিতে জল ফুটছে? এত বেলায়?

—সকাল থেকে চা খাইনি। বানাচ্ছি, আপনি খাবেন?

শুভেন্দু আরাম করে বসে। চিনির খুব টানাটানি, রেবা তাই সকালে এক কাপের বেশী চা দেয় না আজকাল। একদিন খুব পীড়াপীড়ি করতে বাতাসা দিয়ে চা বানিয়ে দিয়েছিল। সাবিত্রী বৌদি অনেক সৌখিন, উনি চিনি ছাড়া চা খান না। তিন টাকা-

সাড়ে তিন টাকার অস্বস্তিটা শুভেন্দুর অনেকখানি কেটে যায়। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে দুটো সব সময় চেঁচামেচিতে বাড়ী মাথায় করে —এ-বাড়ীটা কি সুন্দর নিরিবিলি। সাবিত্রীর আঁটো শরীরের ব্যস্ত চলা ফেরার দিকে শুভেন্দু তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যের সময় খেয়ে-দেয়ে নাইট ডিউটির জন্যই বেরিয়েছিল অজিত। গিয়ে শুনলো, মালিকদের এক ভাই মারা গেছে বলে সেদিন অফিস বন্ধ থাকবে। কম রাত্তিরে ঘুমনো তার অভ্যেস নেই, সুতরাং নাইট শো-তে সিনেমা দেখবে ঠিক করে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো। ফিরে দেখলো, সাবিত্রী গেছে রেবাদের বাড়ীতে গল্প করতে। অজিতও সেখানে চলে এলো। কি একটা হাসির কথায় ওরা তিনজন তখন দুলে দুলে হাসছে, এমনকি ছেলেমেয়ে দুটোও হাততালি দিচ্ছে না বুঝে। অজিত নাইট ডিউটি দেয়—আর সকালে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। অজিতের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না শুভেন্দুর। সব শুনে শুভেন্দু বললো, ভালোই হয়েছে, এসো আজ এখানে আড্ডা দেওয়া যাক। রেবা খিচুড়ি চড়িয়ে দাও না—এখানেই সবাই খেয়ে নিই। অজিত খেয়েছে তো কি হয়েছে, আবার খাবে।

অজিত বললো, তার চেয়ে চলো, আজ আমরা সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখে আসি। অনেকদিন ওসব দেখি-টেখিনি— বৈজয়ন্তীমালার কি যেন একটা বই এসেছে—

শুভেন্দু বললো, ধ্যুৎ! সিনেমা দেখে কি হবে! এই তো বেশ গল্প জমেছিল—তা ছাড়া ওসব হিন্দী বই-টই আমার তেমন ভালো লাগে না।

—তা হলে চলো বাংলা-বইতেই যাই—অ্যাণ্টুনি ফিরিঙ্গি না কি বই যার কথা যেন তুমি বলেছিলে সাবু?

সাবিত্রী বললো, হ্যাঁ ঠাকুরপো, চলুন, সবাই একসঙ্গে দেখে আসি।

শুভেন্দু তবু ইতস্ততঃ করে, বলে, রবিবার চলুন না। এখন নাইট শোতে যাওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট।

সাবিত্রী বলে, আহা, একদিন তো মোটে, সবাই মিলে বেশ আনন্দ করে যাবো। রেবা, তোমারও তো ও বইটা দেখা হয়নি বলেছিলে। কত্তাকে বলো না একটু আলিস্যি ভাঙতে।

রেবা বললো, হ্যাঁ। বইটা দেখার তো খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু- । রেবা আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কোনো বার্তা পাবার আশা করে।

অজিতের খুব উৎসাহ—সে সিনেমা দেখবেই আজ। কিন্তু শুভেন্দু আর রেবার একসঙ্গে যাওয়ার সত্যিই খুব অসুবিধে—সন্তু-মান্তু কার কাছে থাকবে? ওদের সঙ্গেও নিয়ে যাওয়া যায় না, রাত জাগার অভ্যেস নেই—ওরা একেবারে ঘুমিয়ে কাদা হবে। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো, রেবা যাবে ওদের সঙ্গে, শুভেন্দু ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাড়ীতে থাকবে। অজিত আর সাবিত্রী বাড়ী চলে গেল, সাবিত্রীর তো কাপড় বদলাতে হবে।

ছেলেমেয়ে দুটোকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুইয়ে তারপর রেবা নিজের সাজ-পোশাকে মন দেয়। ইদানীং গায়ে একটু মাংস লাগায় ব্লাউজগুলো ছোট ছোট হয়ে এসেছে। তলপেট খানিকটা উঁচু উঁচু—শুধু শায়া-পরা, এই অবস্থায় কেউ দেখলে ভাববে—বুঝি রেবার আবার শিগগিরই ছেলেমেয়ে হবে—কিন্তু রেবা আর ওসবের মধ্যে যেতে চায় না। দুটো বাচ্চা হবার পর ব্রেসিয়ার পরা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিল রেবা—আজ আবার তোরঙ্গ খুলে একটা বার করলো।—শুভেন্দু খাটের ওপর বসে অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটা বই পড়ছে। রেবা কাছে এগিয়ে এসে বললো, শোনো—

বই থেকে মুখ না তুলেই শুভেন্দু বললো, কি? বলো?

—অজিত ঠাকুরপোকে আমার টিকিটের দামটা দিয়ে দেবো?

—অজিত কি তা নিতে চাইবে ?

—আমার লজ্জা করে। অন্য কেউ টিকিট কাটলে আমার অস্বস্তি হয়। তুমি বরং না করে দিলেই পারতে।

—অজিত অত করে বলছিল। যাওনা, কি হয়েছে তাতে। তুমি বরং এক কাজ করো, গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিয়ো। বাস না করে যদি ট্যাক্সিতে যায় -শুভেন্দু একটু দ্বিধা করলো, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললো, ট্যাক্সিভাড়াটাও দিয়ে দিয়ো—তাহলে টিকিটের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হবে।

—আহা, গাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে মেয়েমানুষ বুঝি ভাড়া দিতে পারে ? কি রকম খারাপ দেখায় না ?

—তুমি দিতে চাইবে, তাতে যদি আপত্তি করে তো—ক' টাকা আর আছে ?

—দেখিনি। দেখছি। সতেরো-আঠারো টাকার বেশী নেই, তা ঠিক জানি।

—একটা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে যাও। ভাড়া দিতে চাইবে, খানিকটা জোরাজুরি করবে—তাও যদি না নিতে চায়—তোমার ডিউটি ফুরিয়ে গেল। ভদ্রতা যতখানি করবার তা করলেই তো হল।

—তবু আমার কি রকম লাগবে।

রেবার সত্যিকারের অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দুর মায়া হয়। সামান্য হেসে সে বলে, আহা, অত খুঁতখুঁত করো না। সিনেমা দেখতে যাচ্ছো—ভালো মন নিয়ে যাও। না-হয় সামনের মাসে আমরাও টিকিট কিনে ওদের একটা সিনেমা দেখিয়ে দেবো। এই শাড়িটা পরেছো কেন, ঐ সবুজ শাড়িটা পরে নাও—ওটাকে তোমাকে ভালো মানায়।

ওরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত শুভেন্দু জেগে থাকে। ছেলেমেয়ে দুটো বিরক্ত না করে অঘোরে ঘুমোয়। শুভেন্দু একখানা লম্বা

উপন্যাস প্রায় শেষ করে ফেলে। বাড়ির সামনে ট্যাকসির আওয়াজ পেয়ে সে সচকিত হয়ে ওঠে। অজিত আর সাবিত্রী ওপরে ওঠে না, সেইখান থেকেই হাত নাড়িয়ে বিদায় নেয়। অনেকদিন বাদে রেবা খুশীতে একেবারে ঝলমল করে। কি চমৎকার বই, উত্তমকুমারকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! আসবার সময় ট্যাকসিতে কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া। অজিত ঠাকুরপো যে গান জানে তাও রেবা জানতো না। আসবার পথে কি চমৎকার সিনেমারই গানগুলো গুন গুন গেয়ে শোনালো!

শাড়িটা যত্ন করে খুলে খুলে পাট করে রাখতে রাখতে রেবার কি যেন মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি হাতব্যাগটা খুলে নীল রঙের পাঁচ টাকার নোটটা বার করে শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে—দ্যাখো, এক পয়সাও খরচ হয়নি।

—তুমি দিতে চেয়েছিলে তো?

—হ্যাঁ। আমাকে ধমক দিলেন। যাবার সময় ট্যাকসি, আসবার সময় ট্যাকসি, দু'টাকা কুড়ির টিকিট—আবার বাক্স ভর্তি আইসক্রীম খাওয়ালেন। খুব ভালো লোক, এমন আমুদে, মানে ওরা দুজনেই খুব ভালো।

—হ্যাঁ, সেই কলেজের সময় থেকেই তো জানি অজিত খুব আমুদে ও দিলদরিয়া। নাইট ডিউটিতে খাটতে-খাটতে বেচারার স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে গেছে এখন।

—আমি কিন্তু রান্না করে ওদের দু'জনকে খাওয়াবো বলেছি একদিন। এক রবিবার।

—বেশ তো। সাবিত্রী বৌদিও তো গত মাসে সন্তু-মান্তুকে খাওয়ালেন একদিন।

—তুমি সেদিন মুরগী কিনে এনো কিন্তু। দুটো মুরগী লাগবে। খুব বড় সাইজ হলে একটাতেও হবে অবশ্য, কিন্তু ছোট ছোটকেনাই ভালো, মাংস কচি হয়—আরচারটে ঠ্যাং পাওয়া যাবে।

—আনবো আনবো। এরপর দেখো অজিতও একদিন আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে আমি বলে রাখলুম, দেখো তুমি মেলে কিনা। ওর স্বভাবই এইরকম, জানি তো।

সাবিত্রীর ঝি ছুটতে ছুটতে এ-বাড়ীতে এসে খবর দিল। দিদিমনি অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাত্তির সওয়া আটটা বাজে মোটে। আধ ঘণ্টা আগে অজিত নাইট ডিউটি দিতে চলে গেছে—এখনও বোধ হয় অফিসে পৌঁছয়নি। শুভেন্দু আর রেবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। ঝি বললো, দিদিমনি হঠাৎ বাথরুমে যেতে গিয়ে কি দেখে যেন ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সাবিত্রীর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, রেবা আর শুভেন্দু ধরাধরি করে তাকে খাটে এনে শোওয়ালো।

শুভেন্দুই এ-পাড়ায় অপেক্ষাকৃত পুরানো বাসিন্দা। তার ডাক্তারের সঙ্গে চেনা আছে, দরকার হলে ধারে ওষুধ আনতে পারে। শুভেন্দু দ্রুত গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলো।

বিশেষ কিছুই হয়নি সাবিত্রীর।

শুভেন্দু ভাবছিল অজিতের অফিসে ফোন করবে কিনা, টেলিফোন নম্বর সে জানেও না অবশ্য, তবে অজিতের অফিস সেই ক্লাইভ রোডে, বাড়ী থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। জ্ঞান ফিরে আসবার পর সাবিত্রীই টেলিফোন করতে বারণ করলো।

সাবিত্রী ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমের জানলার পাশে সে মানুষের ছায়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। বীভৎস চেহারা।

শহরতলির এ অঞ্চলটা সন্ধ্যের পরই বেশ নির্জন হয়ে যায়, রাস্তার আলো নিবু নিবু হয়ে জ্বলে, বেশির ভাগ বাড়ীরই ঘর-কন্নার কাজ মিটে যায় আটটা-ন'টার মধ্যে। তবু এই কাঁচা রাত্তিরে ভূত? শুভেন্দুর ইচ্ছে না থাকলেও হেসে উঠলো। বললো, বৌদি আপনার ফিটের ব্যামো-ট্যামো আছে নাকি?

—কোনোদিন না!—সাবিত্রীর জ্ঞান ভালো করে ফিরে এলেও হাঁটুর কাছে একটু মচকে গিয়ে ব্যথা করছে। রেবা বললো, ভূত না হলেও চোর-ডাকাত হওয়া বিচিত্র নয়। প্রায়ই তো শুনি এখানে ওখানে!

শুভেন্দু বললো, এই সন্ধ্যে রাত্তিরে চোর-ডাকাত? তাদের প্রাণের ভয় নেই?

—দিনে দুপুরেও তো আসে।

সাবিত্রী সত্যিই কাতর হয়ে পড়েছে, বিছানা ছেড়ে ওঠে না, রোগিণীর মত শুয়ে থেকে অনর্থক অজিতের নামে দোষারোপ করতে থাকে। কি ছাই চাকরি—শুধু নাইট ডিউটি আর নাইট ডিউটি! আগে তবু মাসে এক দু' সপ্তাহ ডে-ডিউটি থাকতো, আজকাল টানা। এ দেশে আর যেন কেউ চাকরি করে না! শুভেন্দুর সন্দেহ হয় কোনো একটা তুচ্ছ কারণে আজ অজিতের সঙ্গে সাবিত্রী বৌদির বোধহয় খুব ঝগড়া হয়েছে। নইলে বেশ শক্ত ধরনের স্ত্রীলোক, তার ত অকস্মাৎ ভূতের ভয় পাবার কথা নয়। তবুও সাবিত্রীর ভয়-পাওয়া অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। এমনকি, ছেলেমানুষের মত ইচ্ছে হয়, মুখে কালিঝুলি মেখে সে-ই ভূত সেজে আবার সাবিত্রীকে ভয় দেখায়।

সাবিত্রী ফিসফিস করে রেবাকে বললো, মানদা কোথায়?

ঝি কাছাকাছি নেই। সাবিত্রী কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে বসে বলে, ও হারামজাদীকে আমি কালই তাড়াবো। আজ রাত্তিরেই বিদায় করবো। ওকেই আমার বেশী ভয়।

—কেন? কেন? শুভেন্দু আর রেবা দু'জনেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সাবিত্রী বলে, ওকে কি কোনো বিশ্বাস আছে? আজ সন্ধ্যে বেলাতেই দেখলাম, দোতলা থেকে রাস্তায় কারুর সঙ্গে যেন ইশারা করে কি কথা বলছে। রাত্তির বেলাও যদি সাঁট করে কোনো

গুণ্ডা-বদমাসকে বাড়ীতে ঢোকায়, অনায়াসেই আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে না ? তারপর গয়না-গাঁটি যা আছে।

রেবা সমর্থন জানিয়ে বলে, এইজন্যই তো আমি ঝি-চাকর রাখা পছন্দ করি না। নিজের হাতে সব কাজ করবো তা-ও ভালো, তবু সব সময় চোরের ভয়—

শুভেন্দু মনে মনে হাসে। ক'দিন আগেই একটা ঝি রাখার জন্য রেবা খুব বায়নাক্কা তুলেছিল। তার যে এত চোরের ভয় তা তো সে জানতো না!

রেবা সাবিত্রীকে গাঢ় সহানুভূতির সুরে বলে, সত্যিই এরকম রাতের পর রাত একা থাকা তোমার সাহস বটে। আমি হলে তো পারতুম না, ভয়েই মরে যেতুম। তাও দু' একটা ছেলেমেয়ে থাকলেও বা কথা ছিল। একটা কোনো প্রাণী।

সাবিত্রী উত্তর দেয় না। বড় নিঃশ্বাস ফেলে। যত রাত বাড়তে থাকে, তত সাবিত্রীর ভয় বাড়ে। ডাক্তার এসে ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে গেছে, সেটা খেয়ে ঘুমোতেও তার ভয়। রাতের পর রাত যে দরজা-জানালা এঁটে একা ঘুমিয়েছে, আজ রাজ্যের ভয় তাকে পেয়ে বসে। সাবিত্রী রেবার হাত ধরে অনুরোধ করে, সেই রাতটা অন্তত রেবাকে এসে তার কাছে থাকতে। ছেলেমেয়ে নিয়েই আসুক না—তার তো বেশ বড় ঘর—সবাই কুলিয়ে যাবে।

—তার চেয়ে বৌদি আপনিই আসুন না—আমাদের বাড়ীতে থাকবেন—আমাদেরও তো দুটো ঘর। আপনি রেবার সঙ্গে থাকবেন—শুভেন্দু প্রস্তাব দেয়।

সাবিত্রী চোখ-মুখে কষ্ট ফুটিয়ে বলে, শরীরটা বড় দুর্বল লাগছে, হাঁটতে গেলে যদি ঘুরে পড়ে যাই আবার ? কথা বলতে বলতে সাবিত্রী মেজের আলমারি-ট্রাঙ্কগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। শুভেন্দু বুঝতে পারে, গয়নাগাঁটি জিনিসপত্র খালি বাড়ীতে ফেলে সাবিত্রী যেতে চায় না। নীচতলার ভাড়াটেদের সঙ্গে অজিত

কি কারণে যেন একদিন তুমুল ঝগড়া করছিল—তারা তো ওপর-তলায় ডাকাত পড়লেও ফিরে চাইবে না।

খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই রেবা রাজী হয়ে যায়। বরং তার মুখে-চোখে এমন উৎসাহের ভাব ফুটে ওঠে যে, শুভেন্দু অবাক হয়ে যায়। যেন রেবা হঠাৎ কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব পেয়েছে। ঘুরে ঘুরে সে সাবিত্রীর ঘরখানা পরিদর্শন করে। অজিতের আলাদা খাট—বেশ পরিষ্কার করে বিছানা পাতা, সুন্দর শান্তি-নিকেতনী বেডকভার—সেই খাটে বসে পড়ে রেবা বলে, এই তো এই খাটেই আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে কুলিয়ে যাবে। এবার থেকে তো রোজ রাত্তিরেই আমি এখানে এসে থাকতে পারি। এই বলে সে শুভেন্দুর দিকে রসের দৃষ্টিতে চায়।

ছেলেমেয়েকে খাইয়ে ও-বাড়ীর বিছানা-টিছানা পেতে রেখে তারপর আসবে—এইজন্য তাড়াতাড়ি চলে যায় রেবা। ততক্ষণ সাবিত্রীকে পাহারা দেবার জন্য শুভেন্দু এখানে থাকে। ঘুরে ঘুরে জানলা-দরজাগুলো পরীক্ষা করে দেখে শুভেন্দু। বেশ মজবুতই আছে, জানলা-দরজা সব বন্ধ করে পাখা চালিয়ে শুলে ভয়ের কিছু নেই।

শুভেন্দু ভূতের কথা তুলে সাবিত্রীকে রাগাতে চায়। কি রকম দেখলেন? ভুষো হাঁড়ির মত মুখ? চোখ দুটোর ওখানে গর্ত না আগুন জ্বলছিল?

সাবিত্রী রাগ করে না, হাসেওনা—দুঃখিত ভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আপনি ওসব বুঝবেন না, আমার সত্যিই ভয় করে। এই বলে সে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। শুভেন্দু এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বিছানার কাছে বসে ডাক্তারের রুগী দেখার মতন অবলীলাক্রমে সাবিত্রীর চোখের দিকে তাকায়। নিষ্পলক চোখ। এ দৃষ্টি যে শুভেন্দুর একেবারে অচেনা—তাতো নয়। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই শুভেন্দু হাতটা আরও এগিয়ে এনে সাবিত্রীর কপালে

খে। সুস্থ মানুষের তপ্ত কপাল। সাবিত্রী তখনও কোনো কথা ল না। আপন মনেই শুভেন্দু তার একটা আঙুল সাবিত্রীর ঁটে ছোঁয়ায়। নরম ঠোঁট ফাঁক করে দেয় সাবিত্রী, তার দৃষ্টি রও ঘন হয়ে আসে। সাবিত্রীর ভয় পাওয়ার কারণটা বুঝতে রে শুভেন্দুও হঠাৎ যেন ভয় পায়। ভূত দেখার প্রত্যাশায় চোখে ড়াতাড়ি জানলা-দরজার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে খান থেকে।

রেবার কথা ভেবে শুভেন্দুর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তার াবর ডে ডিউটি, প্রত্যেক দিন দুপুরবেলা রেবা বাড়ীতে একা কে—ছেলে-মেয়ে দুটোও ইস্কুলে চলে যায়। একটা ঝি চাকর খতে পারেনি, রেবার অনেক কষ্ট। শুভেন্দু রেবাকে আরও শী কষ্ট দিতে চায় না।

## মঞ্জরি

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি সেই কতক্ষণ ধরে। কখন বাস আসবে তার ঠিক নেই। এতক্ষণে মাত্র একটা বাস এসেছিল, তাতে এত ভিড় যে পা রাখাও অসম্ভব। আমি হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে পারি না। অথচ বাসে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও নেই এখন। মধ্য কলকাতায় বিকেলবেলায় ট্যাক্সি পাওয়া একটা অলৌকিক ব্যাপার, ট্যাক্সি পাওয়ার চেয়ে একটা নতুন গাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ।

বিরক্ত হয়ে ভাবছি শেষ পর্যন্ত হেঁটেই যাবো কিনা, হঠাৎ এই সময়ে রাস্তার ওপারের একটা বইয়ের দোকান থেকে মঞ্জরী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। আশ্চর্য, মঞ্জরী এতক্ষণ আমার এত কাছাকাছি ছিল আর আমি শুধু শুধু বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছি! ও দোকানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কয়েকবার, বেশ ভিড়, দু' একটি মেয়ের পিঠ দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তেমন মনোযোগ দিই নি।

এক এক সময় মনে হয়, পৃথিবীতে কোনো ময়লা নেই, দুর্গন্ধ নেই, ঘাম নেই। কোথাও মানুষকে মানুষ মারছে না। মোলায়েম স্নিগ্ধ হাওয়ায় পৃথিবীটা ভরে গেছে। মঞ্জরীকে দেখলে আমার এই রকম হয়। একথাও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মঞ্জরীকে দেখলে আমার বুক কাঁপে। কেন কাঁপে? পৃথিবীর কোনো বিশেষজ্ঞ এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

মঞ্জরী আমাকে এখনো দেখতে পায় নি। ডাকবো? মঞ্জরীর সঙ্গে আর একটি মেয়ে রয়েছে, তাকে আমি চিনি না। যাই হোক, আমার আর এখন বাসে ওঠবার তাড়া নেই, কোথায় যেন যাবার কথা ছিল তাও ভুলে গেছি।

মঞ্জরী তার সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে কথা বলায় খুব মগ্ন হয়ে
াছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরেই
াটতে লাগলো। একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমার দৃষ্টির আড়ালে
ল যাবে।

রাস্তা না পেরিয়ে আমিও এ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।
রকম করার যে কি মানে হয় কে জানে? আমি কি এক্ষুণি রাস্তা
ারয়ে গিয়ে মঞ্জরীর নাম ধরে ডাকতে পারি না? সেটাই তো
বচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু এই রাস্তাটা যেন একটা নদী, আমরা
'জনে দু'দিকে রয়েছি, পার হবার উপায় নেই।

একটা ট্যাক্সি দারুণ শব্দে ব্রেক করলো। একটি ছেলে প্রায়
পা পড়ে যাচ্ছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে। বেঁচে গেল
ক্সিড্রাইভারটিও। সেই শব্দে রাস্তার সব লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে,
কিয়েছে সেইদিকে, মঞ্জরীরাও। এবারও মঞ্জরী আমাকে দেখতে
ল না। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, এই মঞ্জরী—

মনে মনে আমি দেখতে চাইছিলাম, মঞ্জরীই রাস্তা পেরিয়ে
সে কি না, কিংবা আমাকে যেতে বলবে ওদিকে। যেন এর
রেই অনেকখানি নির্ভর করেছে। মঞ্জরী আমার ডাক শুনতে
নিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকালো, তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে
স ঝলমল করে তুললো মুখখানা। আমি তখনো চুপ করে
ড়িয়ে আছি, আমাকে ডাকলো না, মঞ্জরীই সেই মেয়েটির সঙ্গে
া এলো রাস্তার এদিকে। যাক, একটা ব্যাপার চুকে গেল।

মঞ্জরী এসে বললো, এই সুনীলদা, এদিকে কোথায়
চ্ছেন?

মঞ্জরীকে দেখার পর আমার আর কোথাও যাবার থাকে না,
নো কাজের কথাই মনে থাকে না, কিন্তু মুখে সে কথা বলা যায়
। আমি একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বললুম, এই এদিকে এসে-
লাম একটু বিশেষ কাজে। তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

—বই কিনতে এসেছিলাম। একে চেনেন, এর নাম সর্বাণ
আপনাদের বাড়ির কাছেই থাকে।

মঞ্জরী দেখতে সুন্দর, বড্ড বেশী সুন্দর—এত সুন্দর যে এক
ভয় করে। কেননা, কোনো সুন্দর জিনিসই পৃথিবীতে বেশীদি
থাকে না। সর্বাণী মেয়েটি সাদামাটা। দেখতে খারাপ নয়, ত
কেউ সুন্দরীও বলবে না। অন্তত মঞ্জরীর পাশে দাঁড়ালে। সর্বা
বোধহয় একটু বেশী লাজুক। আমাকে দেখে ছোট্ট একটু নমস্ক
করলো।

আমি মঞ্জরীকে বললাম, বাড়ি ফিরবে কি করে? এখন ে
বাসে-ট্রামে উঠতে পারবে না। একটা মিছিল বেরিয়েছে, ত
ট্র্যাফিক জাম।

মঞ্জরী হাসতে হাসতে বললো, আমি বাড়ি ফিরবো না।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবে?

—কোথাও একটা গেলেই হয়। এখনো ঠিক করিনি।

এখন, এই মুহূর্তে সর্বাণীর উচিত বিদায় নেওয়া। আমাদে
দু'জনকে আলাদা থাকতে দেওয়া। এখন মঞ্জরী বাড়ি যাবে ন
আমারও কোথাও যাবার নেই, আমরা পৃথিবীর শেষ সীমানে
যেতে পারি।

মঞ্জরী অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, সুনীলদা, আপনি একা
সর্বাণীকে পৌঁছে দিন না। ও তো আপনার বাড়ির দিকেই।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি তো এখন বা
ফিরবো না।

—কেন ফিরবেন না? না হয় আমার কথা শুনেই এক
ফিরুন। সর্বাণী যদি বাসে উঠতে না পারে—আপনার উচিৎ ন
ওকে পৌঁছে দেওয়া?

সর্বাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না, না, আমাকে পৌঁছে দি
হবে না। আমি ঠিক যেতে পারবো।

মঞ্জরী রীতিমতন ধমক দিয়ে বললো, না, তুই দাঁড়া। সুনীলদা তোকে পৌঁছে দেবে।

আমি বললাম, তা না হয় পৌঁছে দেবো, কিন্তু তোমাকে রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে যাবো নাকি? তুমি কোথায় যাবে?

মঞ্জরী কি বুঝতে পারছে না, আমি শুধু ওর সঙ্গে যাবার জন্যই ব্যাকুল। কতদিন নিরালায় ওর সামনে মুখোমুখি বসে কথা বলিনি!

মঞ্জরী খুব দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে বললো, আপনি কি ভাবছেন আমি নিরুদ্দেশে যাচ্ছি নাকি?

—তুমি যে বললে বাড়ি ফিরবে না? সন্ধ্যের পর বেশীক্ষণ তো তোমায় বাইরে থাকতে দেখিনি!

- বাড়িতে তো ফিরবোই না! এই তো কাছে, আমহার্স্ট স্ট্রীটে আমার মামার বাড়ি—ক'দিন ধরে ওখানেই আছি।

—বাঃ। তাহলে তো খুবই ভালো হলো। চলো, কোথাও বসে একটু চা খাই। কিংবা, কফি হাউসে যাবে?

—এখন? ইমপসিবল্! আমাকে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরতেই হবে।

প্রথমবার যদি রাজী না হয়, তাহলে হাজার অনুরোধ করলেও মঞ্জরীকে আর রাজী করানো যাবে না, আমি জানি। আমিও গম্ভীরভাবে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে চলি—

—একি, আপনি যে বললেন সর্বাণীকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন?

—আমি সত্যি এখন বাড়ি ফিরবো না, আমার অনেক দেরী আছে।

সর্বাণী রীতিমতন লজ্জা পেয়ে বলতে লাগলো, সত্যি, কোনো দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারবো, রোজ যাই—

সর্বাণী আমার চোখে চোখ রেখে বললো, সুনীলদা, প্লীজ আজ ওকে পৌঁছে দিন। আমার একটা কথা রাখবেন না?

মঞ্জরী আমার কোনো কথা রাখবে না, কিন্তু ওর কথা আমাকে রাখতেই হবে। এই ওর জোর। এই জোর ও কোথা থেকে পেল কে জানে। কিন্তু আমিও তো অগ্রাহ্য করতে পারি না।

সর্বাণীকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিলাম ঠিকই, কিন্তু সারা রাস্তা সে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বললো না। বলবেই বা কেন?

মঞ্জরীর সঙ্গে আবার একদিন দেখা হলো রমেনের বাড়িতে। রমেনের বোনের বিয়ে ছিল সেদিন। এক গাদা ভিড় ঠেলে এসে মঞ্জরী আমাকে বললো, সুনীলদা, আপনাকে আমি ভীষণ খুঁজছি। আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার।

লাল রঙের বেনারসীতে মঞ্জরী একেবারে রাজেন্দ্রানীর মতন সেজেছে। তার মুখেও একটা লালচে আভা। আমি বললুম, উঃ কি দারুণ সেজেছো—আজ তোমারই বিয়ে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

প্রশংসায় লজ্জা পায় না মঞ্জরী। ছেলে মানুষের মতন খুশী হয়। বললো, আমি ঠিক জানতুম, আপনি প্রশংসা করবেন। আপনার কথা ভেবেই তো এরকম সাজলুম।

—সত্যি!

—সত্যি না তো কি মিথ্যে কথা বলছি!

—আমার তো আজ এখানে আসবার কথাই ছিল না। আমার আজ জামসেদপুরে যাবার কথা—নেহাৎ ট্রেন বন্ধ—

—আমি ঠিক জানতুম, আপনি আসবেন!

এসব প্রেমের কথা নয়। ইয়ার্কির কথা। মঞ্জরী এরকম বলতে ভালোবাসে। আমিও শুনতে ভালবাসি। আশে-পাশের লোকদের অগ্রাহ্য করে বললো, আপনাকে আমি ক'দিন ধরে যা খুঁজছি না! এত দরকার আপনার সঙ্গে।

—কোথায় কোথায় খুঁজলে বলো তো?

—সব জায়গায়! কোথাও আপনাকে পাওয়া যায় না! কোথায় থাকেন সারাদিন?

—আমার বাড়িতে একবারও খোঁজ করেছিলে? একজন মানুষকে পাওয়ার সবচেয়ে সোজা উপায় তো তার বাড়িতে—

— আপনি একবার আমার খোঁজ নিতে পারেন না?

—তুমি তো সব সময়ই ব্যস্ত। কত তোমার অ্যাডমায়ারার! যাকগে আমার সঙ্গে কি দারুণ দরকারী কথা আছে বলছিলে?

—আমার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ডটা হারিয়ে গেছে। কি করে রিনিউ করতে হয় আমি জানি না। আপনি একটু করে দেবেন?

আমি একটু দমে গেলাম। একটু কেন, বেশ খানিকটা। এই দরকার!

খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, এইজন্য? একি আর কেউ করে দিতে পারতো না? এটা তো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়?

—আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

—এইজন্যই বুঝি আমাকে তোমার মনে পড়ে?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে অদ্ভুতভাবে হাসলো মঞ্জরী। এ মেয়েকে ঠিক ছলনাময়ীও বলা যায় না। মঞ্জরী শুধু মঞ্জরীর মতন। ওকে একটু আঘাত দেবার জন্য আমি বললাম, আজকাল আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বেশী যাই না। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না! অন্য কারুকে বলো।

গাঢ় অবিশ্বাসের চোখে মঞ্জরী আমার দিকে তাকালো, একটু ম্লান হয়ে বললো, আপনি আমার জন্য এটুকু করে দেবেন না? কার্ডটা হারাবার পর থেকেই আপনার কথা ভেবে রেখেছি।

—আচ্ছা, আচ্ছা দেবো এখন। আমাকে দেখলেই তোমার শুধু কাজের কথা মনে পড়ে। আমি যে তোমার জন্য অতদূর যাবো—তার জন্য আমাকে তুমি কি দেবে?

মঞ্জরী আমার বাহুতে ওর হাত ছুঁইয়ে বললো, আপনি কি
চান বলুন ?

—আমি কেন চাইবো ? তুমি নিজে থেকে বুঝি দিতে
পারো না ?

—আপনি না চাইলে আমি বুঝবো কি করে ? বলুন আপনি
কি চান ?

—যা চাইবো, তাই-ই দেবে ?

—চেষ্টা করবো।

আমার বাহুতে মঞ্জরীর হাত, আমি চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝর্ণার জলের মতন ঝকঝকে মুখ, ওর দৃষ্টিতে কোনো মালিন্য নেই। আমি আর কি চাইবো ? দেবী মূর্তির সামনে বসে স্বামী বিবেকানন্দও কিছু চাইতে পারেন নি। এই হচ্ছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, এর দিকে তাকিয়ে থাকলে বুক শিরশির করে, কিন্তু এই সৌন্দর্য কখনো সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। গাছ থেকে ছেঁড়ার পরের মুহূর্তেই ফুল আর সেই ফুল থাকে না।

—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না, কিছু চাই না।

- সেইজন্যই তো আপনাকে এত ভালো লাগে। আপনি কিছু
চান না।

—আর সবাই বুঝি চায় ?

—আপনি বুঝি জানেন না ? পৃথিবীতে সবাই তো সব সময়
হাত বাড়িয়ে বলছে, দাও, দাও, আরও দাও—

—আমি সে কথা বলিনি ! তোমার কাছে অন্যরা অনেক কিছু
চায় ?

মঞ্জরী আমার হাতের ওপর ছোট্ট একটা চড় মেরে
বললো, ধ্যাৎ !

মঞ্জরী এই পৃথিবীতে এসে অনেক কিছু পেয়েছে। জন্মেছে সচ্ছল পরিবারে, গা ভরা রূপ ও স্বাস্থ্য—সেই সঙ্গে ওর মালিন্যহীন

প্রাণশক্তি। সুঠাম সুবেশ যুবকরা মঞ্জরীর চারপাশে তো ঘুরঘুর করবেই। মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা করার বেশী সুযোগ আমার হয় না। কখনো কখনো খুব ইচ্ছে হয়, কোথাও নিরালায় মঞ্জরীকে নিয়ে বসে থাকি- আর কোন চোখ সেখানে উঁকি দেবে না— আমি মঞ্জরীকে একটু ছুঁয়ে দেখবো। ঐ রূপ, ঐ সৌন্দর্যের বিভা সব সময় মনের মধ্যে ছায়া ফেলে থাকে। অবশ্য মঞ্জরীর সঙ্গে সেরকমভাবে দেখা হয় খুব কমই। মঞ্জরী যখন আমাকে দেখে, কথা বলে খুবই অন্তরঙ্গভাবে—আবার যখন দেখা হয় না তখন ভুলে যায় আমাকে।

হঠাৎ কোনো কাজের দরকার হলে মনে পড়ে আমাকে। হঠাৎ বিকেল বেলা অফিসে টেলিফোন বেজে ওঠে, তুলেই শুনতে পাই মঞ্জরীর ব্যস্ত গলা, সুনীলদা, কোথায় আপনি ? বারবার টেলিফোন করেও পাওয়া যায় না !

আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কতবার টেলিফোন করেছিলে ?

—অনেকবার ! আপনি আমাকে একবার টেলিফোন করতে পারেন না ?

—অকারণে তোমাকে টেলিফোন করবো কেন ?

—অকারণে ? আমার সঙ্গে বুঝি আপনার কথা বলতে ইচ্ছে করে না ?

—ইচ্ছে করলেই কি পৃথিবীতে সবকিছু হয় ? আমার তো আরও অনেক কিছু ইচ্ছে করে। যাকগে, কি জন্য হঠাৎ তলব ?

—কিছুর জন্য না ! এমনিই। শুনুন, আজ সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসতেই হবে কিন্তু !

—আজই ? অন্য একদিন গেলে হয় না ?

—না, না, আজই। কোনো কথা শুনতে চাই না, আসতে হবেই ! আপনার সঙ্গে ভীষণ দরকার।

অন্য কেউ যদি পাশ থেকে শুনতো এই কথাবার্তা, তাহলে কি মনে করতো না যে আমাদের দু'জনের মধ্যে গভীর টান? এমন জোর দিয়ে তো যে-কোনো মেয়ে ডাকতে পারে না। আমারও তো না গিয়ে উপায় নেই।

এবারও গিয়ে যথারীতি নিরাশ হলাম গোপনে। খুবই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। মঞ্জরীর এক মামা থাকেন নিউগিনিতে। তিনি একখানা মস্তবড় খাতা-ভর্তি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, নিজের টাকাতেই ছাপাবেন। কিন্তু তার আগে, মঞ্জরী চায় আমি যেন সেটা আগাগোড়া পড়ে আমার মতামত জানাই। আমি তো লেখক, তাই আমার মতামতের মূল্য আছে। তা ছাড়া বানান ও ভাষাও ঠিক করে দিতে হবে আমাকে।

আমি বললাম, এইজন্য টেলিফোনে এত জরুরী ডাক? এটা তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেও পারতে।

—কেন, আপনাকে আমি ডাকতে পারি না? আপনার সময় নষ্ট হলো?

—তা তো হলোই! তাছাড়া, এসব আজেবাজে লেখা আমার পড়তে ভালো লাগে না। এই রকম ঘুচিমুচি হাতের লেখা—

—সুনীলদা, আমার জন্য আপনি এইটুকু কষ্ট করবেন না?

সেই অধিকারহীন দাবি জানায় মঞ্জরী। কি করে যেন জেনে গেছে, এক হিসেবে আমি ওর ক্রীতদাস। ও যদি বলে, সুনীলদা আমার জন্য আপনি সাপের মাথার মণি এনে দিন! আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবেন না? তাহলেও আমাকে সাপের মাথার মণির জন্যই যেতে হবে।

মঞ্জরীর বিয়েতে আমি যাইনি। মঞ্জরী যখন নেমন্তন্ন করতে এসেছিল,আমি বাড়িতে ছিলাম না,নিজের মুখে নেমন্তন্ন জানাবার সুযোগ পায়নি। আমিও একটা ছুতো করে সেই সময়টা কলকাতার বাইরে চলে গেলাম। আমার ঈর্ষা খুব প্রবল। আমার চোখের

সামনে মঞ্জরীর হাতের ওপর কেউ হাত রাখবে—এটা সহ্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যদিও জানতাম, মঞ্জরীর একদিন তো বিয়ে হবেই—কিন্তু সে দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখার দরকার নেই। পৃথিবীতে আমার চোখের আড়ালে তো কত রূপ ঝরে যায়, কত সৌন্দর্য অন্যের ভোগে লাগে, তা নিয়ে তো আর আমার মন খারাপ লাগে না।

বিয়ের পর মঞ্জরী চলে গেল বাঙ্গালোরে। ওর স্বামী ওখানে খুব একটা বড় কাজ করে। মঞ্জরী ওখানেই থাকবে। সুতরাং আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে না। অফিস থেকে আমাকে সাউথ ইণ্ডিয়া পাঠাতে চেয়েছিল বিশেষ কাজে, আমি কিছুতেই রাজী হলুম না যেতে। মাঝে মাঝে মঞ্জরীর খবর এর-ওর মুখে শুনতে পাই। মনে মনে ভাবি, মঞ্জরী যেন সুখে থাকে, ভালো থাকে।

এলিট সিনেমার সামনে মঞ্জরীকে দেখে সত্যি খুব চমকে গিয়েছিলাম। কবে যে কলকাতায় এসেছে, তাও শুনিনি। বিয়ে হয়েছে দু'বছর আগে, কিন্তু একটুও বদলায় নি চেহারা। কিংবা হয়তো বদলেছে, আমার চোখে ধরা পড়েনি। পাশে দাঁড়িয়ে ওর স্বামী, বেশ সুপুরুষ ও ভদ্র।

মঞ্জরীই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বললো, এই সুনীলদা, এই তো আজ ধরেছি। আমাদের বিয়েতে যান নি কেন?

প্রশ্নটা এড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মঞ্জরী, তুমি কেমন আছো?

—ভালো আছি।

আরও কিছুক্ষণ কথা হলো। কিন্তু সে সব কথা আমি মন দিয়ে শুনি নি। একটি কথাই আমার কানে বাজতে লাগলো, ভালো আছি। ভালো তো থাকবেই, দুঃখ মানায় না মঞ্জরীকে, আমিও চাই মঞ্জরী ভালো থাকুক। কিন্তু আমাকে আর দরকার নেই

মঞ্জরীর। এবার আর বললো না, একটা দারুণ দরকারে আপনাকে খুঁজছি।

আর বলবে না, আমার জন্য এইটুকু কষ্ট করবেন না ?

যে-কথার উত্তরে আমি বলতে পারতাম, তার বদলে আমাকে কি দেবে তুমি ?

—আপনি কি চান বলুন ?

—আমি কিচ্ছু চাই না।

এসব কথা আর বলা হবে না। বুকের মধ্যে সরু সুতোর মতন একটা ব্যথা ঘুরে বেড়ায়। বিদায় নেবার আগে মঞ্জরী বললো, সুনীলদা, আপনার খবর-টবর সব ভালো তো ? ভালো আছেন তো ?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

## হলুদ বাড়ি

পাহাড়ের ধার ঘেঁষে একটা হলুদ রঙের বাড়ি। ও বাড়িতে যারা থাকে, মনে হয় যেন তারা এই পৃথিবীর কেউ নয়।

ভোরবেলা আমি চলে আসি পাহাড়ের ধারে সেই হলদে বাড়ির ঠিক পেছনেই মুসলমান বস্তিতে। ইয়াকুব মিঞা এখানে প্রত্যেক- দিন একটা পাঁঠা কেটে বিক্রী করে। ছোট জায়গায় এর বেশী লাগে না, এবং এই একটিই মাত্র মাংসর দোকান। কোনো কোনোদিন সব মাংস বিক্রী হয়ে যায় চোখের নিমেষে, আবার এক একদিন বেলা ন'টা পর্যন্ত পরিত্যক্ত মাংসখণ্ডের ওপর মাছি ভনভন করে।

আমার মায়ের অসুখ। পাঁঠার মেটুলি সেদ্ধ করে সেই জল তাঁকে প্রত্যেকদিন খাওয়ানো ডাক্তারের নির্দেশ। আমার মায়ের অসুখ খুব কঠিন, তিনি আর কতদিন বাঁচবেন সেটাই এখন প্রশ্ন। অথচ মনের মধ্যে তবু একটা ক্ষীণ আশা থাকে মা হয়তো আবার একদিন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠবেন। অত্যন্ত ঝাল দিয়ে মাংস রান্না করে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে, কেমন হয়েছে বলু তো? কেমন হয়েছে?

মাকে এখন অত্যন্ত বিস্বাদ খাবার খেতে হয়।

কিন্তু প্রত্যেকদিন পাঁঠার মেটুলি পাওয়াই শক্ত। ইয়াকুব মিঞাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে এইটুকু রাজি করানো গেছে যে অন্য খদ্দেররা না নিতে চাইলে তবে তিনি আমাকে দেবেন।

আমাদের বাঙালীদের স্বভাব, আড়াই শো, পাঁচ শো গ্রাম—যে যতটাই মাংস কিনি, তার সঙ্গে দু'এক টুকরো মেটুলি চাই ফাউ। সুতরাং পাঁঠাটা কাটবার আগে থেকেই আমাকে গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রথম খদ্দের থেকে শেষ খদ্দেরটিকে পর্যন্ত বোঝাতে হয়, দয়া করে মেটুলি নেবেন না, আমার বাড়িতে রুগী আছে—

অনেকে বোঝে, দু'একজন মানতে চায় না। দোষ দিতে পারি না তাদের। দু'এক টুকরো সুস্বাদু ফাউ মেটুলি কেনই বা ছাড়বে সকলে? কেউ কেউ আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ বা অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে বলে, আচ্ছা। বন্ধুরা আমার মায়ের অসুখের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা যে আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করতে চান শুধু, তা নয়। যাদের নিজেদের শরীরে অসুখ আছে, তারা অন্যের অসুখের বিবরণ শুনে আনন্দ পায়।

ইয়াকুব মিঞার দোকানের পাশে একটা পাকুর গাছেরগুঁড়িতে আমি বসে থাকি। যেদিন দশটা বেজে গেলেও কিছুটা মাংস পড়ে থাকে—সেদিন মেটুলির সঙ্গে ঐ বাকি মাংসও কিনতে হয় আমাকে বেশ গায়ে লাগে। আমাদের অবস্থা সেরকম নয়।

ইয়াকুব মিঞার গায়ের রং টকটকে ফর্সা, লম্বা চওড়া শরীর, এখন একটু বয়েস হলেও এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন। মাংস বিক্রেতা না হলে চলচ্চিত্রের অভিনেতা হলে তাঁকেমানাতো। কিম্বা, প্রকান্ড ছুরিটা নিয়ে তিনি যে-ভাবে পাঁঠাটার ঘাড় কচ্ করে কেটে ফেলেন, নিপুণ হাতে ছাল ছাড়িয়ে নেন, হাড়গুলোকে টুকরো করেন দেশলাই কাঠি ভাঙবার মতন—তাতে মনে হয়, উনি সামান্য দোকানদারি না করে একটা ডাকাতের দল খুললেই পারতেন তো। ওঁর থেকে অনেক অযোগ্য ডাকাতে দেশটা গিজগিজ করছে।

অবশ্য, ইয়াকুব মিঞা লোকটি দয়ালু। ওঁর ছেলে যখন ওঁর জন্য চা নিয়ে আসেন, উনি আমার দিকে আঙুল তুলে বলেন, ঐ বাবুকে চা দে।

আমি প্রত্যেকদিন আসি এবং বসে থাকি বলে আমার সঙ্গে একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা দাম হলে, উনি আমাকে পঁচিশ পয়সা ছেড়ে দেন। আমার আপত্তি শোনেন না।

সকালবেলা এই মাংসের দোকানের সামনে বসে বসে সময় কাটা-বার জন্য আমি অনবরত সিগারেট ফুঁকি আর সুযোগ পেলেই তাকিয়ে দেখি ঐ হলুদ বাড়িটার দিকে।

হলুদ বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে একটু উঁচুতে, তাই এখান থেকে সব কিছু দেখা যায় না। তার ফলে, দেখা না দেখার নেশা এক রহস্য।

ও বাড়ির সকলে ভোরে ওঠে। প্রথমে দেখতে পাই একজন বৃদ্ধকে, যার মাথার চুল ধপধপে সাদা। তিনি দোতলার বারান্দায় প্রত্যেকদিন ভোরবেলা এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাত-জোড় করে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেন এবং বিড়বিড় করে উচ্চারণ করেন মন্ত্র।

বলাই বাহুল্য তিনি আমাকে প্রণাম করেন না। আমি যেদিকে বসে থাকি, সেই দিকেই সূর্য ওঠে! তবু আমি খেলাচ্ছলে, তিনি প্রণাম করার পর, হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করি।

বৃদ্ধের চেহারা বড় সুন্দর। বস্তুত, ও বাড়ির সকলেই সুন্দর। আলাপ পরিচয় না হলেও আমি জানি, ও বাড়িতে কে কে থাকে। ঐ বৃদ্ধ, যিনি রিটায়ার্ড জজ, তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী, এক ছেলে তিন মেয়ে, বড় মেয়ের জামাই এবং দুটি নাতি নাতনী। ছেলে ও জামাইটি গ্রীক যুবকের মতন সুঠাম। তিন বোনকে দেখলে মনে হয় রুবেন্স-এর ছবি থেকে উঠে এসেছে, বিবাহিতা মেয়েটি একটু পৃথুলা—কিন্তু রুবেন্স তো পৃথুলা মেয়েদেরও রূপ দেখিয়ে-ছেন। বাচ্চা দুটি যেন স্বর্গ শিশু।

বাচ্চা দুটিকে নিয়ে সেই তিন নারী যখন পাহাড়ের ওপর দিকে বেড়াতে যায়, তখন আমি মাঝে মাঝে চোখ রগড়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করি। আমি কি সত্যিই এরকম একটি কিছু দেখছি, না অলৌকিক কোন দৃশ্য। নারীরা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা, শিশু দুটি টকটকে লাল রঙের জামা পরেছে -এক্ষুনি

যেন ওরা ফুল বা প্রজাপতি হয়ে মিলিয়ে যাবে। কিংবা, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে একটু বেরিয়ে আসবে স্বর্গে।

আমি একটু বেশী রোমান্টিক প্রকৃতির বটে। এরকম কল্পনা করতে ভালোবাসি। কিন্তু বসে আছি একটা মাংসের দোকানের সামনে, মাটিতে সদ্যকাটা পাঁঠাটার রক্ত একটা কুকুর চক্‌চক্‌ করে চেটে নিয়ে এখন বসে আছে টুকরো টাকরা হাড়ের আশায়। ভন ভন করছে নীল মাছি, ইয়াকুব মিঞার হাতে বিরাট ছুরি, খদ্দেররা কেউ লোভী, কেউ কৃপণ। এটা একটা বাস্তব দৃশ্য। কিন্তু একটু দূরের ঐ হলদে বাড়িটা, ঐ বাড়িতে যে সুন্দরের অধিবাস, তাও কি বাস্তব?

মনে হয়, ও বাড়িতে কোন নীচতা, ক্ষুদ্রতা নেই। কোনোদিন ও বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটির আওয়াজ তো দূরের কথা উঁচু গলার কথা পর্যন্ত শুনিনি। শুনেছি বটে হাসির ঝংকার, প্রায়ই। কেউ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, পরের মুহূর্তে ঘরগুলির এক একটা জানালার পাশ দিয়ে চলচ্চিত্রের মতন একজন হেঁটে যায়, কে যেন কাকে ডাকে, এই মৌ, মৌ—। সব মিলিয়ে যেন একটা খেলা। বাগানের সামনে কোনো কোনো সকালে ওরা ব্যাড-মিন্টন খেলে।

ওদের বাড়ির কেউ মাংস কিনতে আসে না। চাকর পাঠায়। চাকরটা পর্যন্ত বেশ ভদ্র।

মাংসর থলিটা হাতে নিয়ে প্রায় মাইল দেড়েক হেঁটে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়। আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাঁটি। বাড়িতে পেঁাছে স্বপ্ন ভেঙে যায়।

বাবা একটা ঘি ওয়ালাকে মারতে উঠেছেন। তার মুখের সামনে বিরাট হাতখানা তুলে বাবা বলছেন, একখানা চড় মেরে তোর দাঁতগুলো ভেঙে দিই হারামজাদা।

ঘি ওয়ালার রোগা পটকা চেহারা। ঘিয়ের ব্যবসা করাও লোকটা নিজে নিশ্চয়ই ঘি খায় না। তা ছাড়া, আবার ভেজাল ঘি।

চেঞ্জারদের সবাই ঠকাতে চায়, এ তো জানা কথা। কিন্তু আমার বাবাকে ঠকানো সোজা কথা নয়। আমার বাবা দুর্দান্ত প্রকৃতির পুরুষ। তাঁর স্বাস্থ্য বিশাল, গলার আওয়াজ বাজখাঁই, রাগও তেমনি ভয়ংকর। অথচ এইরকম চেহারা ও মেজাজ নিয়েও তিনি সারাজীবন করপোরেশনের অ্যাসেসিং ইন্সপেক্টর হয়েই রইলেন। ঐ চাকরি কি এই লোককে মানায়? ইয়াকুব মিঞার যে রকম ফিল্ম স্টার কিংবা ডাকাতের সর্দার হওয়া উচিত ছিল, তেমন আমার বাবারও হওয়া উচিত ছিল গত শতাব্দীর জমিদার কিংবা চা বাগানের ম্যানেজার। জমিহীন জমিদারী মেজাজের লোকদের জীবন সুখের হয় না। তার ওপর তিনি যদি এক শতাব্দী পরে জন্মান।

আমি ঘি ওয়ালাকে বিদায় করে দিলাম। তখন বাবা বকাবকি করতে লাগলেন আমাদের রাঁধুনি দুখিয়ার মাকে। সে-ই ঘি ওয়ালাকে ডেকে এনেছে।

বকুনি খেয়ে দুখিয়ার মা বললো, আমি কাল একজনকে ডেকে আনবো, সে একেবারে এক নম্বর আদমী। কোনদিন ঝুট বলে না।

বাবা বিদ্রূপ করে বললেন, থাক্, তোমাকে আর লোক ডাকতে হবে না। আমি খাদি ভান্ডার থেকে ঘি আনবো। যত সব চোরের রাজত্ব।

আসল ব্যাপারটা আমি জানি। আমাদের ঘিয়ের দরকার নেই। ওসব বিলাসিতার সময় এখন নয়। কিন্তু দুখিয়ার মা আগে সব বড় লোকদের বাড়িতে রান্না করেছে। সে ঘি ছাড়া মাংস রান্নার কাজ ভাবতেই পারে না। রুগীর রান্না না হয় আলাদা হলো, তা বলে অন্যদেরও—। আমার দিদি সেই শুনে বলেছিল, দ্যাখো না, এদিকে তো শুনেছি, সস্তায় ভালো ঘি পাওয়া যায়।

দিদি বরাবরই একটু বোকাসোকা মানুষ। কোথায় কি কথা বলতে হয় জানে না। মায়ের এরকম অসুখের কথা শুনে দিদি আর জামাইবাবু এখানে এসেছিল পাটনা থেকে। কলকাতা পর্যন্ত এতদূর

সহজে যাওয়া হয় না, কিন্তু মধুপুর অনেক কাছাকাছি। জামাইবাবুর অনেক কাজ,তাই দু'দিন থেকেই দিদিকে আর ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে কেটে পড়েছেন। মায়ের তো সেবা করার লোকের দরকার।

বউদি আবার এই জন্য চটে আগুন। সেবা করার যেন লোকের অভাব! মায়ের চিকিৎসার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে, এর মধ্যে আবার বাচ্চাদের নিয়ে দিদির থেকে যাওয়ার খরচ বাড়লো। তা ছাড়া, দিদির বাচ্চা দুটো দারুণ। দাদা কলকাতায় থেকে খেটে খেটে মরছে, প্রত্যেকদিন ওভারটাইম খেটে টাকা রোজগার করে পাঠাচ্ছেন এখানে। বৌদির রাগ তো হবেই।

এই সময় দিদির থেকে যাওয়াটা বাবা কিংবা মা-ও পছন্দ করেন নি। তবু ওঁদের এক কালের আদরের মেয়ে মুখে কিছু বলেননি। কিন্তু বৌদি অন্য বাড়ির মেয়ে,সে কেন অত সহ্য করবে, সে বলতে ছাড়ে না। সুতরাং আমার বোকাসোকা ভালোমানুষ দিদিকে প্রায়ই বৌদির কটাক্ষ সইতে হয়। দিদির দুটি ছেলেমেয়ে, সন্তু আর ঝুনাকে একটু আড়ালে পেলেই বৌদি দারুণ মুখ ঝামটা দেন!

ওটাও একটা বাস্তব দৃশ্য। ঐ মাংসের দোকানের মতন। কিন্তু পাহাড়ের ধার ঘেঁষা, ঐ হলদে বাড়িটা? সেটাও কি এরই মতন বাস্তব? সেই বাড়ির বাগানে পায়ে লাল চটি পরা রমণীরা সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিতে হাঁটে। কে যেন কাকে মধুর গলায় ডাকে, মৌ, এই মৌ—। এ যেন একটা শিল্প।

আমি এখনও বেকার বলেই বৌদির মন যুগিয়ে চলি সব সময়। এটা আমার ইনসটিংকটিভ। বৌদির সঙ্গে প্রায় আধা-প্রেমিকের মতন ব্যবহার করি বলেই দাদার অনুপস্থিতিতে মাংসের নড়ি হাড় আমার পাতেই পড়ে। খিদের সময় খাবার কম পেলে একদম মন ভালো থাকে না।

এই বাস্তব দৃশ্যে বাবা আবার এক দুপুরে আরও একটু বাস্তবতা

যোগ করলেন।

আমার লুকিয়ে সিগারেট খাবার আলাদা জায়গা ছাদ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদে উঁকি মেরেই সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আবার সরিয়ে নিতে হলো। বাবা দুখিয়ার মাকে নিয়ে খেলা করছেন।

এ যেন বয়স্ক পুরুষের পুতুল খেলার দৃশ্য। বাবা তাঁর দৈত্যের মতন শরীর নিয়ে দুখিয়ার মাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়েছেন। ছটফট করছে দুখিয়ার মা, কিন্তু তার কোমরের কাছটা শক্ত মুষ্টিতে আটকানো।

ঠিক সময়ে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিলাম, তাই আমাকে দেখতে পাননি বাবা। তবু আমার মধ্যে একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে হতে লাগলো, আর একবার মুখ বাড়িয়ে বাকি অংশটুকু দেখার। অতি কষ্টে এই ইচ্ছেটুকু সামলালাম।

দুখিয়ার মা'র নামটা শুনলে একটা মলিন ছবি ফুটে উঠলেও, বস্তুতপক্ষে সে একটি অতি স্বাস্থ্যবান আদিবাসী যুবতী। সে ভিজে কাপড়ে থাকলে মুনি ঋষিরাও তার দিকে চোখ ফেরাতে পারবে না। এখন সে ভিজে কাপড়ে আছে। এবং আমার বাবা মুনি-ঋষি নন।

আমার বয়েস তেইশ, বাবার বয়েস চুয়ান্ন। নারী সঙ্গের জন্য শরীরের মধ্যে কি রকম ঝড় ঝাপটা ওঠে, তা আমি জানি। আর প্রবল স্বাস্থ্য নিয়ে বাবা যে অসহায় বোধ করবেন, া তো স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। আমার মা দু'বছর ধরে শয্যাশায়ী। বাবা যদি গত শতাব্দীর জমিদার কিংবা চা বাগানের ম্যানেজার হতেন, তা হলে তাঁর কোন অসুবিধে হতো না। তাঁর নিজের চরিত্রের পক্ষে ভুল সময়ে জন্মেছেন বলেই, দুপুরবেলা ছাদে—ছেলেমেয়েদের দেখে ফেলার ঝুঁকি নিয়েও—।

দুখিয়ার মায়ের সঙ্গে আমি নিজেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে নেবো ভেবেছিলাম কয়েকদিন ধরে। বাজারের খরচ থেকে এই

মতলবেই দু'এক টাকা সরাচ্ছিলাম। দুখিয়ার মার স্বামী ভালো খেতে দিতে পারে না। তার স্বামী কাজ করে এখান থেকে একশো ষোল মাইল দূরে, বছরে দুবার মাত্র বাড়ি আসে। সুতরাং সে যদি কখনো দুরন্ত প্রকৃতির মনিবের আলিঙ্গনে ধরা দেয় দু'একবার, তা হলে আশ্চর্য কি আছে? এ-ও যদি বাস্তবতা না হয়, তা হলে বাস্তব কাকে বলে?

চুপি চুপি নিচে এসে এই সব কথা ভাবলেও আমার বুক কাঁপতে থাকে। সিগারেট ধরাবার সময় যে হাত কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারি। নিজেকে সহজ করতে পারি না কিছুতেই। এতখানি বিচলিত হয়ে পড়ার কারণ আমি নিজেই ধরতে পারি না। আমার কি বাল্যস্মৃতি মনে পড়ছে? অনেক ছেলেবেলা বাবাকে-মাকে ঠিক এইরকম ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দু'একবার দেখে ফেলেছিলাম। তার সঙ্গে আজকের ঘটনার তফাৎ আছে। তখন বোধ করেছিলাম ঈর্ষা। আজ বোধ করছি করুণা। বাবার সম্পর্কে মায়া জন্মে আমার।

মাকে ভালবাসতাম আমি। তাই ছেলেবেলার দৃশ্য দেখে ঈর্ষা বোধ হয়েছিল। আর দুখিয়ার মাকে আমি নিজেই চেয়েছিলাম শারীরিক ভাবে—তবু আজ ঈর্ষা হয় না। বরং আস্তে আস্তে একটা দানের আনন্দ পাই।

কি খেয়ালে ঢুকে পড়লাম মায়ের ঘরে। মা ঘুমিয়ে আছেন। চেহারাটা এতই ক্ষীণ, যে চেনাই যায় না। মায়ের কপালে একবার হাত ছোঁয়ালাম, তবু মায়ের ঘুম ভাঙলো না। হঠাৎ মনে হলো আমিই যেন ছদ্মবেশী মৃত্যু, চুপি চুপি মাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তাড়াতাড়ি সরে এলাম বিছানার ধার থেকে।

পরদিন সকালে পাকুড় গাছের গুঁড়িতে বসে সিগারেট ধরিয়ে ইয়াকুব মিঞাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ঐ হলদে বাড়িতে কারা থাকে?

ইয়াকুব মিঞা হাতের রক্তমাখা ছুরিখানা পাথরে ঘষতে ঘষতে

বললেন, ওটা তো জজ সাহেবের বাড়ি! বছরে একবার আসেন।

তাকিয়ে দেখলাম, মাথা ভর্তি সাদা চুল সেই বৃদ্ধ বারান্দায় এসে আমার দিকে হাতজোড় করে যথারীতি প্রণাম জানাচ্ছেন।

বাগানের ছোট ছোট চেয়ারে বসে আছে রমণীরা ও যুবকপুরুষ দুজন। ট্রেতে চা ও বিস্কুট এলো। একটু বাদে ওরা পাহাড়ে ওপরের দিকে বেড়াতে যাবে। ওটা একটা সুন্দরের বাড়ি। ওটা অবাস্তব।

আমি ইয়াকুব মিঞাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িটা সারা বছর খালি পড়েই থাকে?

—জী। ভাড়া দেন না ওরা।

—তবু এত সুন্দর সাজানো। চুরি টুরি যায় না কখনো?

ইয়াকুব মিঞা একটু বিরক্তভাবে বললেন, আমাদের এখানে চোর নেই।

আমি মনে মনে বললুম, হুঁ! চোর নেই বললেই হলো, এটা কি একটা অবাস্তব জায়গা? কোনো ভেজাল ঘি ওয়ালাও কি ও বাড়িতে ঢোকে না? যত কিছু বাস্তবতা কি শুধু আমাদের বাড়িতেই?

এরপর ইয়াকুব মিঞা নিজে থেকে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের হিন্দুদের মধ্যে তো বিয়ে ভাঙার আইন পাশ হয়ে গেছে না?

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। এ আবার কি প্রশ্ন? মুখে হ্যাঁ বলে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

—বুড়ো কর্তার মধ্যের মেয়েটি নিজেই একটা হাওয়া ছেলেকে শাদী করেছিল। সে এখন কোথায় ভেগে পড়েছে। কর্তা তার আবার শাদী দেন না কেন বুঝি না।

ব্যাস, আর কিছু দরকার নেই আমার। ঐ সুন্দরের বাড়িতেও দুঃখ আছে।

অলৌকিক ধোঁয়া সরে গেল, দেখতে পেলাম, সেই হলুদ বাড়িটার ছাদের কাছে একটা কাটা দাগ। আগে চোখে পড়েনি। এখন

জানি, ওদের বাড়িতে ফিসফিস করে ঝগড়া হয়। ঐসব নারীদের প্রত্যেকেরই একটা আলাদা চেহারা আছে। ঐ গ্রীক মূর্তির মতন সুঠাম পুরুষ দু'জন শহরের ভিড়ের মধ্যে নগণ্য মানুষ। ঐ বৃদ্ধ, ঐ সৌম্য মুখ ওঁকে আমি কল্পনায় নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে, আমার মায়ের সাথী হিসাবে ওঁকে আমি প্রতিষ্ঠিত করি, আমার মুখরা বৌদির সামনে ওঁর অসহায় চেহারা দেখে আমি বেশ আনন্দ পাই।

আমার বাবাকে আমি এনে দাঁড় করাই এই হলুদ বাড়ির বারান্দায়। দ্বিধাহীন মনে আমি আমার বাবাকে ক্ষমা করে দিই।

## সোনার গয়না

বিয়েবাড়ির এত ভিড়ের মধ্যে কে কি রকম পোশাক পরে, তা আমার নজরে আসে না। মেয়েরা কিন্তু সবই লক্ষ্য করে। সাড়ে সাতশো জন নিমন্ত্রিত পুরুষ আর আটশো জন মহিলাকে বাড়ির মেয়েরা পোশাক দিয়ে ঠিক চিনে রাখে।

আমার মাসতুতো বোন খুকু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাকে সামনে পেয়েই বললে, এই ছোড়দা, একটা হলদে কালো চেক চেক শার্ট পরা ছেলেকে দেখেছিস ?

আমি কিছু না ভেবেই বললাম, না তো ?

দেখিসনি ? তোর সামনে দিয়েই তো এইমাত্র গেল !

তখন আমার মনে হল, হলদে-কালো চেক চেক শার্ট পরা তিন চারজন ছেলেকেই বোধহয় আমি দেখেছি। কিংবা তারও বেশী হতে পারে কিন্তু কোথায় দেখেছি, তা তো মনে নেই ?

খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কি হয়েছে ?

খুকু দারুণ উত্তেজিত ভাবে ফিসফিস করে বলল নতুন বৌয়ের একটা টিকলি হারিয়ে গেছে। হলদে কালো শার্ট পরা একটা অচেনা ছেলে ওখানে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছিল।

চাঞ্চল্যকর সংবাদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মাসতুতো ভাই দীপঙ্করের আজ বৌভাত ! সুতরাং আত্মীয় হিসেবে আমার অনেক কাজকর্ম করার কথা। কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না বলে আমি শুধু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ব্যস্ততার ভান করছিলুম। কিন্তু এই একটা কাজে খুব উৎসাহ দেখানো যেতে পারে। শখের গোয়েন্দাগিরিতে কার না উৎসাহ থাকে। বললাম, চল তো গিয়ে দেখি।

ঠিক হলদে-কালো না হলেও, হলদে খয়েরি রঙের একটা চেক শার্ট আমারও আছে। ভাগ্যিস সেটা আমি আজ পরে আসিনি। আমার আপন মাসতুতো ভাইয়ের বিয়ে, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আজ ধুতি পাঞ্জাবী পরতে হয়েছে।

খুকুর বুদ্ধি আছে, ঘটনাটা সে বেশী লোককে জানাল না। বিয়ে বাড়ির আনন্দ উৎসবের মধ্যে একটা চোর ধরার হুজুগ তোলা ঠিক নয়। সে চুপি চুপি কয়েকজনকে জানাল। গেটের কাছে দুজনকে নজর রাখতে বলল।

আমি ওপরে উঠে এলাম।

দোতলার সবচেয়ে বড় ঘরটিতে নতুন কনেকে বসানো হয়েছে। তাকে ঘিরে যথারীতি মেয়েদের ভীড়।

কনেকে এই প্রথম আমি ভাল করে দেখলাম। আজ বৌভাত। বিয়ের দিনও আমি ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেদিন ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে বৌকে ভাল দেখতে পাইনি।

বিয়ের দিন মোটামুটি চেহারার সব মেয়েকেই বেশী সুন্দরী দেখায়—একে আরো জমকালো দেখাচ্ছিল। লাল রঙের বেনারসীটাতে আবার নানারকম জরির কাজ, কোমরের ওপর থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গয়নায় একেবারে মোড়া। মুখে কত রকম যে রং মাখানো হয়েছে তার ঠিক নেই, দারুণ গরমের মধ্যে মেয়েটি বসে বসে ঘামছিল, মুখে অবশ্য হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। বিয়ে কিংবা বৌভাতের দিনে কনে বউয়ের কোন ব্যক্তিত্ব থাকতে নেই, কারুক সঙ্গে জোরে কথা বলতে নেই। শুধু মিষ্টি মিষ্টি হেসে নমস্কার করাই তার একমাত্র কাজ।

আমি বললুম, ঐ মাথায় টিকলি রয়েছে!

খুকু আমাকে চোখ দিয়ে ধমক লাগাল।

আমি নির্বোধ। টিকলি বুঝি একটার বেশী দুটো থাকতে

নেই? যার এগার জোড়া দুল, চারখানা হার, তিনজোড়া বালা, আঠারো গাছা চুড়ি, তেইশটা আংটি, তারপরেও বাজু, আমলেট-টামলেট আরও কি, তার তো তিনটে টিকলি থাকবেই।

দীপংকর জার্মানি থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে তো, তাই তার বাজারদর ভাল। শুনেছি, এগারটা পাত্রী দেখার পর এই মেয়েকে বাছা হয়েছে। আমার মাসীরা প্রগতিশীল। বিয়েতে পণ নেননি, তবে চল্লিশ না পঞ্চাশ ভরি সোনা, জাপানী ঘড়ি, রেফ্রিজারেটার, আশীখানা প্রণামী, বরযাত্রীদের বাসভাড়া এসব না নিলে এ-রকম পাত্রের মান থাকে কি করে? গরদের পাঞ্জাবী পরে দীপংকর নীচে তার বন্ধুদের তদারক করছে, মুখখানা রীতিমত খুশি খুশি। বিয়ের তত্ত্ব ছাড়া নিমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপহারও এসেছে অনেক। শাড়ি ও গয়নার বাক্স ডাঁই করে রাখা।

আমি ভাবলুম, এত গয়নার মধ্যে একটা টিকলি আছে কি নেই, তা জানা গেল কি করে? সব সময়ই কি একজন কেউ গুনে দেখছে?

না, ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। সেই টিকলিটা দিয়েছেন নতুন বৌয়ের বড় বৌদি। তিনি তাঁর নিজের জিনিসে খেয়াল রাখবেন না! তিনি একনজর দেখেই বুঝেছেন, তাঁর টিকলিটা নেই। শুভ-দিনে তাঁর আশীর্বাদী জিনিসটা হারিয়ে যাওয়া খুবই অন্যায় কথা। বড় বৌদি এমনিতেই নাকি রাগী, তিনি আবার বলেছেন তাঁর শরীর ভাল নেই বলে, এ বাড়িতে কিছু খাবেন না। কুটুম বাড়ীর লোকদের কাছে এ বাড়ির লোকদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এবাড়ীতে তো মেয়েদেরই ভিড়, পুরুষরা দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরেই চলে যায়। কেউ বা উপহারের প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে দিয়েই কেটে পড়ে। এর মধ্যে চেক শার্ট পরা একটা ছেলে কনে বউয়ের কাছাকাছি গেল কি করে? যে করেই হোক গিয়েছিল ঠিকই। এরা ভেবেছে কুটুম বাড়ির কেউ, ওরা ভেবেছে এ বাড়ির

কেউ। এখানে তো দু'পক্ষের সবার সঙ্গে চেনা জানা হয়নি। দীপঙ্কর নাকি কনের ছোট ভাইকেও গুরুজন ভেবে প্রণাম করে ফেলেছে।

আমার মনে হল, সামান্য একটা সোনার জিনিস চুরি গেছে, এই নিয়ে এখন হৈচৈ না করাই ভাল। পরে ভাল করে খুঁজে দেখলেই হবে। নতুন বৌয়ের মুখ দেখে মনে হয়, সেও বোধহয় এখন কোন গোলমাল চায় না।

কিংবা, তার মুখ দেখে যদি আমি বুঝতে ভুল করি, তা বলে দীপঙ্কর কি তাকে আর একটা টিকলি কিনে দিতে পারবে না? তার জন্যে ফুলশয্যার রাতটাকে বিষণ্ণ করার কোন মানে হয় না।

আমি খুকুকে বললাম, এখন আর সে ছেলেটাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, সে-ই যে নিয়েছে তার কি কোন মানে আছে?

খুকু বলল, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মাঝখানে এসেছিল আর একটা পাখা লাগাতে।

তার গায়ে আবার কি রঙের শার্ট ছিল?

মোটা লাল রঙের গেঞ্জি।

আর প্যান্টটা? খাঁকি?

ছোড়দা, তুমি ইয়ার্কি করছ?

এখন চেপে যা। এখন এই গয়না চুরি নিয়ে বেশী কথাবার্তা বলার কোন মানে হয় না। তাতে অন্য নিমন্ত্রিতরা অপমান বোধ করবেন।

কিন্তু আমার উপদেশ গ্রাহ্য করতে কারুর বয়েই গেছে। আমি তো একটা অকর্মার ঢেঁকি ছাড়া আর কিছুই না।

অবিলম্বে মেসোমশাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে?

তারপর মামা মাসী পিসে খুড়োর দল বিশেষত সর্বঘটে

কাঁঠালি কলা আমার মেজকাকা এসে নানারকমজেরাশুরু করলেন। গয়নার স্তূপ ঠিকঠাক সাজিয়ে গোনাগুনি শুরু হয়ে গেল। অন্য মহিলারা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন, দু-একজন উঠে গেলেন ঘর থেকে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল, একজন প্রবীণ গোঁফওয়ালা লোককে সাড়াবাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, অথচ তাকে কেউ চেনে না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ইলেকট্রিক মিস্তিরি যে চারজন রয়েছে তাদের মধ্যে একজনও লাল গেঞ্জিপরা নয়। তাহলে সেই মোটা লাল রঙের গেঞ্জি পরা লোকটা কে? একজন রোগা মতন মহিলা নতুন বউয়ের কাছ ঘেঁষে অনেকক্ষণ বসে ছিলেন, তিনিই বা হঠাৎ কোথায় গেলেন?

হলদে কালো চেক শার্ট সম্পর্কেও নানারকম মতভেদ দেখা গেল। কেউ বলল, হলদে কালো চেক তো নয়, গোলাপি-কালো চেক। আবার আরেকজন বলল, হলদে-কালো বা গোলাপি-কালোর মতন ক্যাটকেটে জামা আজকাল কেউ পরে না, ওটা ছিল কচি কলাপাতা রঙের সঙ্গে আপেল রঙের স্ট্রাইপ।

চুরির কথাটা আস্তে আস্তে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। থার্ড ব্যাচে যারা খেতে বসেছিলেন, তারা চাটনি পরিবেশনের সময় এই খবরটা শুনে এমন আলোচনায় মেতে গেলেন যে খাওয়া শেষ করতে দেরি করে ফেললেন অনেক। বিশ্ব সমস্যার চেয়ে সামান্য একটা সোনার গয়না চুরির গল্প অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

তবু একথা ঠিক, দীপঙ্করের বৌভাতের উৎসব একটু ম্লান হয়ে গেল। অনেকেই নানারকম কাজের অজুহাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

একটা অসৌজন্যের ব্যাপার আমার মাসী-মেসোমশাইদের মনে পড়েনি। এত লোকজনের মধ্যে হঠাৎ একটা চুরির কাহিনী ছড়িয়ে দিলে কারুর কারুর মনে খুব অস্বস্তি জাগে। এক ধরনের

মানুষ আছে, যারা যে-কোন গোলমালের সময়ই নিজেকে দায়ী করে, আমাকে চোর ভাবছে না তো? এর সঙ্গে গরীব বড়লোকের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক বিখ্যাত লোককেও আমি দেশলাই চুরি করতে দেখেছি। খুব ধনী লোকেরাও ক্লিপটো-ম্যানিয়াক হয়। সকলেই অভাবে চুরি করে না, স্বভাবেও কেউ কেউ চোর হয়।

অযত্নে পড়ে থাকা গয়না অন্য কারুর চোখে পড়লে সে তক্ষুণি সেটা ফেরৎ দিতেও পারে, আবার ভাবতে পারে, লুকিয়ে রেখে ওদের আর একটু চিন্তিত করি। সেই রকম কেউ লুকিয়ে রাখেনি তো। সকলকেই যে চিন্তিত করে তুলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই গয়না আর পাওয়া গেল না।

আজকাল বিয়েবাড়িগুলো সব প্রায় একই রকম হয়। বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। দীপঙ্করের বিয়েতে ঐ একটা গয়না চুরির ব্যাপারে বৈচিত্র্য রয়ে গেল। এরপর কয়েকদিন দীপঙ্করের স্ত্রী স্বস্তির নানা রকম প্রশংসা শুনতে লাগলুম। অমন রূপসী মেয়ে কিন্তু একটুও অহংকার নেই। পিওর ম্যাথমেটিক্স নিয়ে এম এ পাশ, অথচ কথা শুনে কে বুঝবে যে অত বিদুষী মেয়ে। যেমন নম্র, তেমন হাসি খুশি, শ্বশুর শাশুড়িকে যা ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাতে আজকালকার বউদের আদর্শ স্থানীয় হতে পারে। শুধু একটি ব্যাপারে সে একটু রহস্যময়ী।

গয়না-চুরির প্রসঙ্গটা চাপা পড়েনি। আজকাল এসব ব্যাপারে কেউ পুলিশে খবর দেয় না। তবু জল্পনা কল্পনা চলতেই লাগল। এই রকম জল্পনা কল্পনার সময় নতুন বউ হঠাৎ মন্তব্য করেছে, কে নিয়েছে আমি জানি। ও কথা থাক। তখন সকলে মিলে তাকে অনেক পেড়াপেড়ি করলেও সে আর নাম বলেনি। বার বার বলছে, ও কথা থাক।

তাতে ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নেয়। এ কথার একমাত্র মানে হয় বাইরের কোন উটকো লোক এসে চুরি করে নিয়ে যায়নি। চেনাশুনো কেউই। এরকম কথা শুনলেই গা শিরশির করে।

চেনাশুনো সব লোকের চরিত্র আজ নতুন ভাবেউদ্ভাসিত হয়। শুধু যে জিনিসটার দামের লোভেই কেউ নিয়েছে, তা না-ও হতে পারে। হয়তো জব্দ করার জন্য, কুটুম্বদের কাছে মুখ ছোট করার জন্য। বেছে বেছে সেইজন্য বউয়ের রাগী বড় বৌদির জিনিসটাই নিয়েছে। বড় বৌদি সেদিন কোন খাবার মুখে না দিয়ে কি অপমানটাই না করে গেলেন।

আত্মীয় স্বজন অনেকের সম্বন্ধেই কানাকানি শুরু হয়ে যায়। দেখা যায়, জব্দ করার জন্য কিংবা অপমান করার জন্য অনেকেই নাকি মুখিয়ে আছে। অমুক কি রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু ভেতরে যে কি বিষ আছে তা আর বুঝতে বাকি নেই। অমুক কাকীমা কি রকম শুনিয়ে গেলেন যে, তাঁর এক বোনপোর বিয়েতে এর ডবল জাঁকজমক হয়েছিল।

আমার মাসতুতো ভাই বোনদের এক বিধবা পিসীমা বহুদিন ধরে ও বাড়িতে আছেন। সকলে তাঁর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ ছিল এতদিন। ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের তিনি কোল পিঠে করে মানুষ করেছেন, সকলকে মায়ের চেয়েও বেশী যত্ন করেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি ঘরে ঢুকে পড়লে সবাই কথাবার্তা থামিয়ে দেয়। অনেকেইএখন লক্ষ্য করেওঁর ব্যবহারটা যেন ইদানীং কেমন কেমন। ওঁর একটি মাত্র ছেলে, ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়েছে,অনেকচেষ্টা করেও তাকে লেখাপড়া শেখানো যায়নি, এখন কোনক্রমে একটা ফ্যাক্টরিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ছেলের ওপর ওঁর বড্ড বেশী বেশী টান। এখন লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেকে বেশী খাবার দেন। ছেলের যা হাতখরচের বহর! সেই খরচ জোগাতে পিসীমা কি করে ফেলেছেন তার ঠিক কি। বয়েস বেশী হলে অনেকের মাথার ঠিক

থাকে না।

পিসীমা বুদ্ধিমতী। দু'দিনেই বুঝে গেলেন অন্যদের মনোভাব। একদিন সন্ধ্যেবেলা নতুন বৌয়ের ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হ্যাঁ গো নতুন বৌ, আমি তোমার টিকলি নিয়েছি? তুমি বলেছ, তুমি জানো কে নিয়েছে। তাহলে আমার মুখের ওপর বল! একথা যদি সত্যি হয়, আমি ঠিক গিয়ে মরব! এতকাল এদের দেখলুম—

নতুন বউ খাট থেকে নেমে এসে পিসীমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলল, দিদি, এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

নতুন বউ খুবই নম্রতার সঙ্গে পিসীমাকে বোঝাল যে পিসীমার কথা সে ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি।

পিসীমা একটু শান্ত হলেন। চোখের জল মুছে বললেন, তাহলে তুমি ঠাকুরের নামে দিব্যি গেলে বল।

নতুন বউ বলল, আমি যে-কোন দিব্যি গেলে বলছি। আমি তো আপনার কথা ভাবিইনি। অন্য কেউই আপনার সম্পর্কে এরকম ভাবতে পারে না।

আপনি ভুল শুনেছেন।

তাহলে কে নিয়েছে?

সেটা আমি বলতে পারব না।

একজন সন্দেহ-মুক্ত হলো। পিসীমা হঠাৎ বেশী বেশী খুশি হয়ে তাঁর যৌবন কালের গল্প বলতে লাগলেন।

এরপর আর একটা আলোচ্য বিষয় এল। কে নেয়নি, নতুন বউ সে কথা বলতে রাজি আছে। তাহলে চেনাশুনোদের মধ্যে কে-কে নেয়নি, তা বলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

খুকু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, তা হলে বল, আমি কি নিয়েছি তোমার টিকলিটা?

তার বৌদিও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, এ কি ভাই! তোমরা

কি এখানে কোর্ট বসাবে নাকি ? একটা সামান্য জিনিস, ছেড়ে দাও না!

বিয়ের পর আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি এক একদিন নেমন্তন্ন খাওয়াই রেওয়াজ। সেই অনুসারে দীপঙ্কর আর ওর স্ত্রী স্বস্তিও একদিন আমাদের বাড়িতে এল, আমি অসামাজিক জীব, রাত এগারোটার আগে কোনদিন বাড়ি ফিরি না। আমার বাড়িতে কেউ এলে আমার সঙ্গে দেখাই হয় না। তবে কিনা দীপঙ্কর জার্মানি যাবার আগে পর্যন্ত আমার খুবই ভক্ত ছিল, তাই সেদিন আমি সন্ধ্যেবেলা বাড়িতেই রইলাম।

দীপঙ্কর শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া সুট, জুতো, ঘড়ি পরে ( মোজা আর রুমাল ও-বাড়ির বোধহয় ) একেবারের শ্বশুরবাড়ির ছেলে সেজে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ির মেয়েকে। ওকে আর চেনাই যায় না।

স্বস্তি ভেতরে গেলে, আমি দীপঙ্করকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলাম। দু-চারটে টুকিটাকি কথার পর জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, সিগারেট খাস না ?

লাজুক মুখ করে ও বলল, তোমার সামনে খাব ছোড়দা ?

পাঁচ বছর জার্মানীতে থেকেও ও এখানে আমার মতন সামান্য গুরুজনের সামনে সিগারেট ধরায় না। সম্বন্ধ করা বিয়ে করে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কির সুরে কথা বলে না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঠিকঠাক নেমন্তন্ন রাখতে যায়। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে। রীতিমত ভাল ছেলে যাকে বলে।

আর আমরা বিলেত জার্মানি কোথাও যাইনি, তবু গুরুজন-ফুরুজনকে অযথা ভক্তি করি না, বাড়ি ফেরার ঠিক নেই, বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবলেই ঘেন্না হয়, এ রকম আরও কত কি। বিলেত জার্মানির থেকেও আমরা অনেক বেশি আধুনিক।

দীপঙ্কর পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করল। এবং সুদৃশ্য লাইটার। অর্থাৎ অ্যামেচার।

সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটান দেবার পর লক্ষ্য করলাম, ওর সঙ্গে আমার গল্প করার মতন কোন বিষয়ই নেই। অথচ আগে দেখা হলে কত বকবক করতাম। ওর পাঁচ বছর প্রবাসের ফলে হয় দীপঙ্করই অনেক বদলে গেছে, কিংবা আমিই বদলে গেছি।

সুতরাং কিছু একটা বলতে হবেই, এই জন্য বললাম, হ্যাঁ রে, তোদের বিয়ের সময় সেই সোনার গয়না চুরির ব্যাপারটা কি হল রে?

দীপঙ্কর বলল, সেটা আর পাওয়া যায়নি।

জিনিসটা দামী ছিল?

পাঁচ-ছশো টাকা দাম হবে।

কথার ভঙ্গি শুনেই বুঝতে পারলাম, দীপঙ্কর পাঁচ-ছশো টাকাকে বেশ মূল্য দেয়। পাঁচ-ছশো টাকা হাতের মুঠোয় এক্ষুনি থাকলে তার একটা মূল্য আছে, কিন্তু যে টাকা হাতে নেই, তার আবার মূল্য কি!

শুনেছিলুম যেন তোর বউ জানে যে কে নিয়েছে?

হুঁ?

কে নিয়েছে?

আমি তো জানি না।

তোকেও বলেনি?

না।

সে কি, নতুন বউরা স্বামীকেও সব কথা বলে না নাকি?

বিয়ে তো করলে না, বুঝবে কি করে এসব?

সুযোগ পেয়েই দীপঙ্কর একটা বিজ্ঞের হাসি দিল। এই সব প্রসঙ্গ এলেই বিবাহিত লোকেরা অবিবাহিত লোকদের এক হাত নেয়। যেন বিয়ে করে একটা মস্ত বড় কাজ করেছে। তাও তো

নিজে করতে পারিস নে, বাপ মা হাত ধরে বিয়ে দিয়েছে।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করব।

না ছোড়দা, তার দরকার নেই। সবাই ওকে এই এক কথা জিজ্ঞেস করে বলে, ও আজকাল বিরক্ত হয়।

ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক সন্দেহ নেই। আমি গল্প-টল্প লিখি বলে আমার কৌতূহলটা আরও বেশী হবে।

খাবার টেবিলে স্বস্তির সঙ্গে আমার প্রথম ভাল করে আলাপ হল। মেয়েটি নম্র হলেও সপ্রতিভ। কথাবার্তা বেশ ভাল বলতে পারে। অনাবশ্যক জড়তা নেই। মেয়েদের আলাদা পরিবেশে কি রকম আলাদা মনে হয়। কনে বউ হিসেবে যে জড়ভরত জাতীয় মেয়েটিকে দেখেছিলাম, আজ সে অন্য রকম। দীপংকরের মুখে কিন্তু সেদিনের মতন আজও একটা গদগদ ভাব।

নতুন বউ হয়েও স্বস্তি আবার পরিবেশনে মা ও বৌদিকে সাহায্য করল। নিয়ম মেনে প্রশংসা করল প্রত্যেকটি রান্নার। তার ব্যবহারে সে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল একেবারে!

স্বস্তি আজও অনেক গয়না পরে এসেছে। নতুন বউদের মাথায় বেশী সিঁদুর এবং গায়ে বেশী গয়না রাখতেই হয় বোধহয়। মা এবং বৌদি তার গয়নার ডিজাইনগুলো নিয়ে যখন আলোচনা করতে লাগলেন, তখন সেও বেশ উৎসাহের সঙ্গে দেখাতে লাগল। পিওর ম্যাথামেটিক্সে এম-এ পাশ হওয়া সত্ত্বেও সে গয়না বেশ ভালবাসে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ভাগ্যিস সে কোন বাকসর্বস্ব ছাত্র নেতা কিংবা ভ্যাগাবণ্ড সাহিত্যিকের সঙ্গে প্রেম করে বসেনি, তা হলে এতসব গয়না পরতে পারত না। কিংবা দু-একটা ছুটকো-ছাটকা প্রেম করেছে বোধ হয়, কিন্তু বিয়ে করবে বাবা মায়ের দেখে দেওয়া পাত্রকে; এটা আগেই ঠিক ছিল। আজ-তো এইটাই কায়দা।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অনেক গয়না পরলেও মাথায় টিকলি তো পরেনি স্বস্তি! তার পরই মনে পড়ল বিয়ের দিন ছাড়া অন্য কোন

সময় কি বাঙালী মেয়েরা টিকলি পরে ? কদাচিৎ এমন দেখেছি বোধহয়। তা হলে তিনটে টিকলি দিয়ে কি হয়। কি আর হবে, ওগুলো পরে গলিয়ে অন্যগয়না বানানো হবে। যদি অন্য গয়না সব থাকে ? তাহলে ও আরো গয়না হবে—নইলে এতরকম ডিজাইন বেরিয়েছে কেন ? তাছাড়া গয়নাই তো মেয়েদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

খাওয়া দাওয়া এবং গল্প সারার পর ওরা বাড়ি যাবে, আমি নিচে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে এলাম। সেখানে গাড়ি আছে ড্রাইভার নেই। ড্রাইভারটা কোথায় গেছে আড্ডা মারতে। দীপঙ্কর নিজে গাড়ি চালাতে জানে বটে, কিন্তু অফিস থেকেই তাকে গাড়ি আর ড্রাইভার দিয়েছে বলে নিজে চালায় না।

ড্রাইভারের অপেক্ষায় আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলাম। ওরা শিগগিরই বেড়াতে যাচ্ছে কাশ্মীরে, আমি কাশ্মীর সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান দিলুম। তারপর হল সদ্য দেখা সিনেমার গল্প। তারপর দীপঙ্করের নিষেধ সত্ত্বেও আমি ফস করে জিজ্ঞেস করলাম স্বস্তিকে, তোমার সেই গয়নাটা কি হল ?

স্বস্তি একটু থেমে বলল, ওটা আর পাওয়া যাবে না।

কে নিয়েছে, তুমি তো জানো ?

তা জানি।

তাহলে তার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছ না কেন ?

সেটা সম্ভব নয়। জিনিসটার ডিজাইনটা খুব সুন্দর ছিল, এইজন্যই আমার যা একটু দুঃখ হয়। যদি টাকা পয়সাও নিত—

এরপর একটা কথা আমার না বললেও চলত, তবু বলে ফেললাম। আমি বললাম, তুমি যখন কারুকে তার নাম বলবেই না, তখন এ-কথাটাও বলা উচিত হয়নি যে তুমি জান কে নিয়েছে।

স্বস্তি বলল, তা ঠিক, আমার বলা উচিত হয়নি। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম।

একটু থেমেই সে মত পাল্টে ফেলল। সে বলল, আমি যে

নিজের চোখে দেখছি একজনকে নিতে। ঐ কথা বলেছি, যাতে সে অন্তত বোঝে যে আমি ঠিকই টের পেয়েছি। আর কেউ না হয় না-ই জানল।

ড্রাইভার এসে গেছে, সুতরাং এ আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না।

এরপর কদিন ধরে আমি অনবরত ভাবতে লাগলাম, গহনাটা কে নিতে পারে। ভেকে ভেবে কোন কুল কি নারাই পেলাম না। ডিটেকটিভ-সুলভ বুদ্ধি আমার একটুও নেই। তারপর নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। জীবনে কত কি ব্যাপার আছে, শুধু শুধু আমি পরের একটা গহনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন!

কিন্তু গয়না আমাকে পেয়ে বসল। রাস্তাঘাটে আগে মেয়েদের শুধু মুখ কিংবা উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতুম, এখন তাদের গয়নাও দেখি। কোন কোন মেয়ের গায়ে একটাও গয়না নেই, অনেকের আবার এক-গা গয়না। কারুকে একটি মাত্র গয়নাতেই বেশ ভাল দেখায়। গয়নায় কারুর রূপ খোলে, নিরাভরণ রূপসীও আছে। নাঃ, এ ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে।

তবে, গয়না নিয়েই একটা মজার ব্যাপার হ'ল। একদিন আমি নাইট শো-তে এক ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। পায়ে কি যেন ঠেকল। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে মনে হল, একটা সোনার বালা। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটার ওপর পা চাপা দিলাম। তারপর অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়, এই ভাবে নীচু হয়ে সেটা নিয়েই ভরে ফেললাম পকেটে।

পরক্ষণেই মনে হল, আমি এ-রকম করলাম কেন? এ তো চোরের মতন ব্যবহার। অন্য কারুর একটা জিনিস এখানে পড়ে আছে, সেটা এ-রকম চুপি চুপি পকেটে ভরে ফেলার কি মানে হয়? আমি দেখছি নিজেকেও এখন চিনি না। আমার শরীরটা

শিরশির করতে লাগল। বাকি সময়টা সিনেমাতে আর মন বসাতেই পারলাম না। তক্ষুনি ঠিক করে ফেললাম, এটা যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবি শেষ হবার পর প্রথমে গেলাম বাথরুমে, পকেট থেকে জিনিসটা বার করে দেখলাম ভাল ভাবে। বেশ মোটা একটা মকর-মুখো বালা, সোনার ভরি সম্পর্কে আমার কোন আন্দাজ নেই, তবে বেশ দামীই হবে মনে হয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের খোঁজ করলাম। সবাই তখন বন্ধ-টন্ধ করবার জন্য ব্যস্ত, সহজে কেউ কথার উত্তরই দিতে চায় না। তারপর জানা গেল ম্যানেজার অনেক আগেই চলে গেছে।

যাকে তাকে তো এরকম একটা দামী জিনিস দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। তাই আমি বালাটা বাড়িতে নিয়ে এলাম খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ আবার সেটাকে দেখলাম নেড়ে চেড়ে। জোড়ের জায়গাটা একটু ভাঙা। সেই জন্যই বোধহয় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে। ইস, যার বালা তার এখন মনের কি অবস্থা! নারী হৃদয়ে সোনার কি স্থান, তা আমি এখন জেনেছি।

বালাটার কথা বাড়িতে কারুকে বললাম না। কে কি রকম উপদেশ দেবে কে জানে! নিজের বুদ্ধি মতন চলাই ভাল। পরদিন বিকেলে আমি আবার গেলাম সেই সিনেমা হাউসে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বললাম।

ম্যানেজার লোকটা সুবিধের না। চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। বালাটা হাতে নিয়ে একটা শিস দিয়ে বলল, ভরি দু-এক তো হবেই। আপনি এটা নিয়ে কি করতে চান ?

যার জিনিস, তাকে ফেরৎ দিতে চাই। যদি এখানে খোঁজ করে—

ঠিক আছে, রেখে যান।

এমনি এমনি ছাড়লাম না। ম্যানেজারের কাছ থেকে রসিদ

লিখিয়ে নিলাম। বালাটার বর্ণনা দিয়ে তাতে লেখা থাকল যে, যেটি উনি আমার কাছ থেকে জমা রাখছেন। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে যদি কেউ ফেরৎ দিতে আসে, তাহলে তিনি তার কাছ থেকেও একটা রসিদ রাখবেন এবং আমাকে সেটা দেখাতে হবে। একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেলাম। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন।

তারপর আমার মাথায় ঘুরতে লাগল একটা অদ্ভুত চিন্তা। যার বালা, তাকে দেখতে কি রকম? তার কি নতুন বিয়ে হয়েছে? বালাটা হারাবার ফলে তার এখন মানসিক অবস্থা কি রকম? বালাটা ফিরে পেয়ে সে কি আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানাবে?

এইসব অলস চিন্তা আর কি? কোন মানেই হয় না।

এমন কি এই কথাও আমার মনে হল, ম্যানেজারটা আমাকে ঠকাবে না তো? সে তো যা-তা কারুর নামে একটা রসিদ লিখিয়ে নিয়ে বালাটা মেরে দিতেই পারে! অত সহজে ওকে আমি ছাড়ছি না। সেই রসিদের ঠিকানা দেখে আমি বাড়িতে খোঁজ করব।

ধরা যাক, সে রকম একটা বাড়িতে আমি গেছি। কে দরজা খুলে দেবে? দরজা খোলার পর আমি যখন বলব…

আবার অলস চিন্তা। পরদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলুম, কেউ বালাটার খোঁজ নিতে আসেনি। এই ব্যাপারটা আবার আমাকে ভাবিয়ে তুলল। একটা দামী বালা ফেলে গিয়েও খোঁজ করছে না? এতই বড়লোক? বড়লোক হলেও সোনা সম্পর্কে তো মায়া থাকে। হয়তো সিনেমা হলে ফেলে যাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। অন্য জায়গায় খুঁজে মরছে। কিংবা হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেছে? মহা মুশকিলের ব্যাপার তো। বালাটা সে সিনেমার ম্যানেজারকে হজম করতে দেওয়া যায় না। ওর কাছ থেকে ফেরৎ নিতে হবে। কিন্তু নিয়ে আমিই বা কি করব? মেয়েলি গয়না, পরের জিনিস, আমি কেন নেব? এসব জিনিস বোধহয় গভর্নমেন্টকে জমা দেওয়া উচিত। কিন্তু গভর্নমেন্ট মানেই

তো একজন অফিসার, তাকে বিশ্বাস করা যায়!

পরপর তিনদিন ম্যানেজারকে ফোন করে জানলুম, কেউ আসেনি নিতে।

এই সময় একদিন রাস্তায় দীপঙ্কর আর স্বস্তির সঙ্গে দেখা। ওদের দেখেই আমার চট করে একটা কথা মনে পড়ল। বালাটা স্বস্তিকে দিয়ে দিলে কেমন হয়? ওদের একটা জিনিস হারিয়েছে, আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি, সেটা ওদের পাওয়াই ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু এই প্রস্তাব কি দেওয়া চলে? ওরা অপমান বোধ করবে না তো? কুড়িয়ে পাওয়া পয়সা অনেকে ভিখিরিকে দান করে। কুড়িয়ে পাওয়া সোনার গয়না পেলে কি করতে হয়?

কথায় কথায় ওদের আমি ঘটনাটা বললুম। স্বস্তি মুখখানা করুণ করে বলল, ইস, যার হারিয়েছে তার কি অবস্থা! আর কেউ তার অবস্থা বুঝতে না পারুক, আমি ঠিক বুঝতে পারছি।

আমার এখন কি করা উচিত বল তো?

আপনার উচিত কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। সিনেমা ম্যানেজারকে ওটা দিলেন কেন?

ঠিক তো।

আপনি নিজের কাছে রাখুন।

সিনেমা ম্যানেজারকে ফোন করতেই তিনি বললেন, আপনি এক্ষুণি এখানে চলে আসুন।

আমি ভাবলাম, তাহলে বুঝি আসল মালিক এসেছে। তক্ষুনি ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম ঘর ফাঁকা, আর কেউ নেই।

ম্যানেজার আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চান? রসিদটা এনেছেন?

কেন?

আপনি আমাকে একটা বাজে জিনিস দিয়ে একটা সোনার

গয়নার রসিদ লিখিয়ে নিয়ে গেছেন ? দিন শিগ্‌গির রসিদটা ফেরৎ দিন।

বাজে জিনিস মানে ?

আজ একটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওরা দেখেই বলল ঝুটো মাল। রোল্ড গোল্ড, সাত আট টাকার বেশী দাম হবে না। বাজে ক্লাসের মেয়েরা পরে, অনেক সময় সিনেমা অ্যাকট্রেসরাও—

ম্যানেজারের কাছ থেকে বালাটা নিয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। ম্যানেজার কেন ওটা স্যাকরার দোকানে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা জিজ্ঞেস করিনি। সোনা ভেবে এই জিনিসটাকে নিয়ে আমিও তো কয়েকদিন সময় নষ্ট করেছি। জানি, দীপঙ্কর আর স্বস্তির সঙ্গে দেখা হলেই এ ব্যাপারটার কথা জিজ্ঞেস করবে। যেমন আমি ওদের সেই হারানো টিকলিটার কথা ভুলতে পারি না। সোনা কি না।

ঝুটো বালাটা আমি চাকার মত রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে দিলাম আর কেউ পেয়ে মজা বুঝুক।

## তুমি সুখী ?

বাসে হঠাৎ দেখা, অনেকদিন পরে। অমিতার হাতে দু-তিনটি প্যাকেট, দোতলা বাসের একেবারে ভেতর দিকে একটি মাত্র সীট খালি আছে, অমিতা সেখানে গিয়ে বসে পড়বার পর দেখল, পাশের মহিলাটি ছন্দা।

দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়নি কখনও, কিন্তু পরস্পরকে এড়িয়ে গেছে এর আগে। কলকাতা শহরে হঠাৎ কোথাও কোথাও দেখা হয়ে যায়ই। সমাজের একই স্তরের মানুষ ওরা দুজনে, একই রকম পরিচয়ের, সুতরাং গতিবিধি ও রুচির মিল থাকবেই। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়, ময়দানের সংস্কৃতি সম্মেলনে বা রবীন্দ্র সদনের কোন অনুষ্ঠানে কিংবা নিউ মার্কেটে কখনও কখনও অমিতা আর ছন্দা কাছাকাছি এসে গেছে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনি—যদিও রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া নয়, তবু এমন অন্যমনস্কতার ভান করেছে যেন দেখতেই পায়নি। চোখাচোখি হলে নিশ্চয়ই কথা বলত। কারণ, ওদের দুজনের প্রকাশ্যে ঝগড়া হয়নি কখনও।

আজ বাসে পাশাপাশি বসে কথা না বলে পারা যায় না। প্রথমে দুজনেই অবশ্য একটু দ্বিধা করল। কে আগে কথা বলবে। অমিতার সুবিধে আছে, সে তার প্যাকেটগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং ছন্দাই বলল, আরে, অমিতা না ?

অমিতা দারুণ চমকের ভাব করে বলল, এ কি ছন্দা ? উঃ কতদিন পরে দেখা ! এতদিন কলকাতাতেই ছিলি ?

অমিতার কথার মধ্যে এই সুর আছে, যেন সে ছন্দার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল, অনেকবার খুঁজেছে তাকে। মাত্র দেড় মাস

আগেই যে কলাভবনে রবিশঙ্করের সেতারের অনুষ্ঠানে মাত্র দুটো রো সামনেই ছন্দাকে দেখেছিল, সেটা গোপন করে যায়।

ছন্দা বলল, বাঃ, আমি আবার কলকাতা ছেড়ে কোথায় যাব? তুই কোথায় ছিলি এতদিন ; তোর পাত্তাই নেই।

দুজনেই মোটামুটি সুন্দরী। বছর আটেক আগে বিয়ে হয়ে গেলেও ওদের মুখ চোখে গিন্নি গিন্নি ছাপ পড়েনি। দুজনেরই স্বামী সুপ্রতিষ্ঠিত। ছিমছাম সংসার। অমিতা তার হাতের প্যাকেটগুলো ঠিক সামলাতে পারছিল না, খসে খসেপড়ে যাচ্ছিল। ছন্দা বলল, দে, আমি দু-একটা ধরছি। অনেক কেনাকাটা করেছিস তো? ছন্দা টেনে নিল দুটো প্যাকেট।

অমিতা বলল, এখানকার লণ্ড্রিতে অনেকদিন জামাকাপড় কাচতে দেওয়া ছিল, ও রোজই ভুলে যায়, তাই আজ আমিই নিয়ে নিলাম। সেই দুটো প্যাকেট।

আর দুটো—

একটা শাড়ি কিনলাম হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়, তারপর ওর জন্য শার্ট আর প্যান্টের পীস, এদুটো অবশ্য কেনার দরকারই ছিল।

ছন্দার মুখে চোখে যে ভারটা ফুটে ওঠে, সেটার ভাষা হল, শাড়িটা খুলে দেখব? নতুন শাড়ি কিনলে দেখতে চায় না,এমনকোন মেয়ে আছে নাকি? কিন্তু ছন্দা সে কথাটা মুখ ফুটে বলল না।

অমিতাও চাইছিল শাড়িটা ছন্দাকে দেখাতে, কিন্তু ছন্দা নিজে থেকে না বললে সে কি করে দেখাবে? ছন্দা যদি মনে করে সে চাল মারছে!

অমিতা তাই বললে, তুই কোথায় যাচ্ছিস এদিকে?

ছন্দা বলল, মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে। এই এক চাকরী হয়েছে,রোজ দুপুরবেলা বেরুতে হয়।

তোর ক'টি ছেলেমেয়ে?

দুটি। ছেলে এখন ইস্কুলে যায় না ভাগ্যিস।

মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে ?  বাস নেই ?

বাস আছে। কিন্তু স্কুলে যাবার সময় তো মেয়ের বাবাই পেঁছে দিয়ে যায়, শুধু ফেরার জন্য বাসে নেয় না।

সত্যি, আজকাল ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর যা ঝামেলা—দুজনেই প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। ট্যাক্সি ধর্মঘট, বিদ্যুৎ সংকট, রেশনের চাল ইত্যাদি বিষয়ে—অর্থাৎ কেউই ব্যক্তিগত কথায় আসিতে চায় না।

ছন্দাই তবু এক সময় বলে, তোর ক'টি ছেলেমেয়ে বললি না তো !

অমিতা হাসতে হাসতে বলল, আমার ভাই ওসব ঝঞ্ঝাট এখনও নেই।

এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে অমিতার মুখের হাসিটা জোর করে ফোটানো। যে নারীর সন্তান আছে, সে-ই তার ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট নিয়ে অনুযোগ করতে পারে। সন্তানহীনার পক্ষে এ অনুযোগ মানায়নি !

ছন্দা এটা বুঝতে পেরেও খোঁচা মারবার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল, তোর একটিও হয়নি এখনও ?

অমিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না।

ছন্দা এবার তাকে বেশ নকল সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তাহলে তুই তো বেশ ভালই আছিস। ইচ্ছে মতন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারিস। আমার তো মেয়ের ইস্কুলের সঙ্গেই জীবনটা বাঁধা।

ছেলেকে এই সময় কোথায় রেখে আসিস ?

বাড়িতে একটা ঝি আছে, খুব বিশ্বাসী।

এরপর কথা ফুরিয়ে যায়। দুজনে একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। দুজনেই কিছু একটা ভাবছে। কিংবা হয়তো একই কথা ভাবছে।

এই সময় কণ্ডাকটার টিকিট কাটতে আসে। দুজনেই অতি দ্রুত পয়সা বার করতে যায়। অমিতা এপাশের দিকে বসেছে

বলেই সে আগে-ভাগে একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দুটো। ছন্দা, তুই কোথায় যাবি?

ছন্দা বলে, না না, আমি টিকিট কাটছি।

আরে না। আমি দিয়ে দিয়েছি তো!

এই তো আমি দিচ্ছি, এই যে শুনুন--

অমিতা এবার বেশ জোর দিয়ে কণ্ডাকটারকে বলে, না, ওর কাছ থেকে আপনি পয়সা নেবেন না। আপনি দুটো কাটুন তো—

কণ্ডাকটার টিকিট ও পয়সা দিয়ে চলে যাবার পর অমিতা একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলে, তুই ও রকম করছিলি কেন? আমি একদিন তোর টিকিটটা কাটতে পারি না?

ছন্দা বলল, না, সেজন্য নয়। তুই টাকা ভাঙাচ্ছিলি, আমার কাছে একগাদা খুচরো রয়েছে কিনা।

থাক, খুচরোও অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

ছন্দা তার ব্যাগে পয়সাগুলো ভরল।

অমিতা বলল, তোর মনে আছে, কলেজে যাবার সময় তুই প্রায় দিনই আমার টিকিট কাটতিস। আমাকে চান্সই দিতিস না।

ছন্দা কোন কথা না বলে অমিতার দিকে তাকাল। একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল অমিতা। সে ভুল করেছে, সে পুরোন দিনের কথা তুলে ফেলেছে। এখনও কি রাগ পুষে রেখেছে ছন্দা?

ছন্দা বলল, মাত্র ন-বছর আগেই তো কলেজে পড়তাম, অথচ মনে হয় যেন সেই কতকাল আগের কথা! তোর টি-কে-বি কে মনে আছে! যিনি আমাদের ফিলোজফি পড়াতেন?

অমিতা বলল, তরুণকান্তি ব্যানার্জি তো? খুব ভাল মনে আছে। দারুণ হ্যাণ্ডসাম ছিলেন।

- তিনি এখন আমাদেরই বাড়িতে অন্য ফ্ল্যাটে থাকেন। খুব ভাব হয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে।

চেহারাটা সেই রকমই আছে ?

প্রায়। একটু বয়েস হয়েছে, তাও বেশ ডিগনিটি আছে।

এক সময় আমরা কি রকম পাগল হয়েছিলাম ওর জন্য ? উনি একটু ডেকে কথা বললে ধন্য হয়ে যেতাম।

আমরা মানে কি, তুই একাই পাগল হয়েছিলি। তুই তো কত-জনকে দেখেই পাগল হতিস ?

ছন্দা আর একটা খোঁচা মারল অমিতাকে। অমিতা বিনা প্রতিবাদে হজম করে গেল। ছন্দাকে সে উল্টে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

তাছাড়া ছন্দার যেন একটা খোঁচা দেবার অধিকারই আছে। সেই রকমই তার মুখের ভাব। অমিতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে একটু একটু হাসে। সেই হাসিতে দুঃখ কিংবা অবজ্ঞা, ঠিক যে কোন্‌টা মিশে আছে, তা বলা যায় না।

এরা দুজনে আগে পাড়ায় থাকত, একই কলেজে পড়ত, কি দারুণ ভাব ছিল ওদের। আজ ওরা কি কথা বলবে এখন খুঁজে পাচ্ছে না। একটি মাত্র ঘটনায় সব কিছু বদলে গেছে।

অমিতাই আড়ষ্ট বোধ করছে বেশি। ছন্দার দিকে সে ঠিক মতন তাকাতে পারছে না। ছন্দার দৃষ্টি যেন অত্যন্ত তীব্র। যেন সে অমিতাকে বিদ্ধ করতে চাইছে।

অমিতা আবার বলল, তোর মা, মানে, মাসীমা কেমন আছেন ?

ছন্দা খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বললে, মা মারা গেছেন!

তাই নাকি ? কবে ?

গত বছর।

তাই নাকি ? ইস—

অমিতার মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ইস, আমাকেএকটা খবর পর্যন্ত দিসনি! কিন্তু ঠিক সময় সামলে নিয়েছে। সে তো নিজে থেকে একবারও ছন্দার মায়ের খোঁজ নেয়নি! এই আট বছরে এক-

বারও যায়নি ছন্দাদের আগেকার বাড়িতে। অথচ কলেজ জীবনে ছন্দার মা কত ভালবাসতেন অমিতাকে, ঠিক নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতেন। অমিতা খুব কম বয়সেই মাকে হারিয়েছে, তাই ছন্দার মাকে ঠিক মায়ের মতন দেখত।

অমিতার ইচ্ছে করতে লাগল, ছন্দার গলা জড়িয়ে ধরে আগেকার দিনের মতন আবার গল্প করে। কিন্তু তার আর উপায় নেই। একটা ঘটনাতেই বদলে গেছে সব কিছু। তখন কলেজে এতসব কিছু খেয়াল ছিল না।

ছন্দা জিজ্ঞেস করলে, তোর ছোট বোন অমলু কেমন আছে?

ভাল।

কোথায় থাকে এখন?

ও তো বিয়ের পর জাপানে চলে গেল। গত বছর একবার বেড়াতে এসেছিল। তোর খোঁজও করেছিল। আমি ভাবলাম, তোরা তখন কলকাতায় আছিস কি না।

ভাদাভাবির তো দরকার ছিল না। ছন্দার বাড়ি খুব ভালই চেনে অমিতা, একবার সেখানে গিয়ে খোঁজ করলেই পারত! সেখানে যাবার মুখ নেই অমিতার। নিশ্চয়ই সে তার বোন সিলুকে আজেবাজে কথা বলে ভুলিয়েছে।

এই রকম ভাবে দুজনে নিরাসক্ত ভাবে এর ওর খবর জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কেউ ভুলেও একবারও কারুর স্বামীর কথা উচ্চারণ করল না। অথচ সেটাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক।

ছন্দার মেয়ের স্কুল এসে গেছে, তাকে এবার নামতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জিজ্ঞেস করল, অমিতা, তুই ভাল আছিস তো?

একটু চমকে উঠল অমিতা। তারপর বেশ জোরে বলল, হ্যাঁ, ভালই আছি। ভাল থাকব না কেন?

ছন্দা বলল, আমি সব সময় তোর ভালই চাই, তুই কি বিশ্বাস

করবি? ওসব পুরোন কথা আর আমার মনে রেখে লাভ নেই। আমার আর মনে পড়ে না। আমি চাই তোরা ভাল থাকিস।

তুই কেমন আছিস?

আমিও ভালই আছি।

সত্যি রে, ওসব পুরোন কথা মনে রেখে লাভ নেই। এখন জীবন অন্যরকম হয়ে গেছে।

চলি—এবার নামতে হবে আমাকে।

তুই তোর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আয় না একদিন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে তো বাচ্চা-টাচ্চা নেই, ওরা এলে ভাল লাগবে।

আচ্ছা আসব এখন।

বাস থামল। নেমে গেল ছন্দা। নীচে নেমে কিন্তু আর তাকাল না অমিতার দিকে। হাঁটতে লাগল মন্থর পায়ে। মুখখানা চিন্তাক্লিষ্ট।

অমিতাকে আরও কিছু দূর যেতে হবে। সে বেশ ভালই বুঝতে পেরেছে যে ছন্দা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনদিনই আসবে না তার বাড়িতে। ও একটা কথার কথা বলে গেল। ছন্দার ছেলে-মেয়েকে অমিতা এখনো দেখেইনি। ইচ্ছে করলে কি আজই দেখে যেতে পারত না? ছন্দার সঙ্গে সে কি নামতে পারত না ওর মেয়ের স্কুলে? তার তো হাতে কোন কাজ নেই বিশেষ। এক সময় ছন্দার সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে, আজ ছন্দা বাস থেকে নেমে একবার ফিরেও তাকাল না। ছন্দা যদি একবার ডাকত, তাহলে অমিতা ঠিকই নেমে পড়ত ওর সঙ্গে।

কিন্তু আর কোনদিন ছন্দা ওকে ডাকবে না। অমিতাও সত্যিই চায় না ছন্দা কোনদিন তার বাড়িতে আসুক। যদি তাপসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়?

তাপস ছিল ছন্দার বন্ধু। ছন্দার বাড়িতেই অমিতার সঙ্গে তার

প্রথম আলাপ। লম্বা চওড়া, সুপুরুষ, সদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। খুবই প্রাণবন্ত ছেলে। সকলেই জানত, ছন্দার সঙ্গে তাপসের বিয়ে হবে। ছন্দার বি, এ, পরীক্ষার আর তিন মাস বাকি, তার পরেই।

হঠাৎ একদিন কি সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। এক বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ তাপস এল অমিতার বাড়িতে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। কঠোর স্বরে বলল, একটা কথা চেপে রেখে আমি কয়েক দিন ধরে খুব ছটফট করছি। কিন্তু আর চেপে রাখতেপারছি না। সে কথাটা কি আপনাকে বলতে পারি ?

অমিতা চমকে গিয়েছিল। তাপসের এ রকম কি কথা থাকতে পারে তার সঙ্গে ? তবু সে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, বলুন!

তাপস আর ভূমিকা করেনি। সোজাসুজি দৃঢ়ভাবে বলেছিল, আমি ছন্দাকে ভালবাসি না। আমি আপনাকেই ভালবাসি! আমি ছন্দাকে ছোট করছি না। সে খুব ভাল, তাকে আমি শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। আপনাকে দেখার পর দিন থেকেই—

এটা একটা অসম্ভব কথা। অমিতার প্রাণের বন্ধু ছন্দা, তার কাছ থেকে কি সে তাপসকে কেড়ে নিতে পারে ? সে প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়েছে, কান্নাকাটি করেছে, তাপসের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করেছে, কিন্তু কিছুতেই তাপস হার মানেনি।

তাপসের প্রবল পৌরুষ উড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। সে বলেছে দয়া মায়া স্নেহের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই। ভালবাসার কি কোন যুক্তি আছে ? সে ছন্দাকে ভালবাসতে পারেনি। অমিতাকে ভালবেসেছে—এর মধ্যে অন্যায়টা কি আছে ?

আস্তে আস্তে অমিতার মন বদলে গিয়েছিল। এর আগে তার কাছে এমন ভাবে কেউ তো ভালবাসার কথা বলেনি। তাপসের মতন এ রকম একজন পুরুষ এমন কিছু দেখছে তার মধ্যে যা অন্যকোন

মেয়ের মধ্যে নেই। এই পুরুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সারা জীবন সে কি নিয়ে থাকবে। অমিতা সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করে ফেলল তাপসকে। তার যুক্তি ছিল, সে তো তাপসকে একটুও প্রলুব্ধ করেনি, তাপস নিজে থেকে এসেছে তার কাছে।

অমিতা বাস থেকে নেমে এক সময় পেঁছেগেল নিজের বাড়িতে। তালা খুলতে গিয়ে হটাৎ তার চোখে জল এসে গেল। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঢোকার সময় তার এ রকম হয়। ছন্দা কোনদিন এবাড়িতে আসুক কিংবা তাপসকে দেখুক, তা সে চায় না। ছন্দা যেন জানতে না পারে, তাপস আসলে কি! তার ভালবাসা এক মাস সতেরো দিন পরই শেষ হয়ে যায়। কোন মেয়েকেই সে বেশীদিন ভাল-বাসতে পারে না। ছন্দার কথা সে কোনদিনও আর উচ্চারণ করেনি—কিন্তু আরও অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—কোন কোনটা কেলেংকারি পর্যন্ত গড়িয়েছে। সে তার নিজের স্ত্রীকে একটা সন্তান পর্যন্ত দিতে পারেনি। বাড়ির প্রতি কোন আকর্ষণই তার নেই, মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দেয়।

অমিতা তালা খুলে ভেতরে ঢুকল। ছন্দা আজ তাকে অনেক-বার খোচা মেরেছে। অমিতা ইচ্ছে করেই তার উত্তর দেয়নি, কারণ, সবচেয়ে বড় আঘাতটা সে-ই দিয়ে রেখেছে ছন্দাকে। ছন্দা কোন-দিনই জানতে পারবে না তাপসের আসল স্বরূপ। সে ভাববে, তাপসকে বিয়ে করে অমিতা খুব সুখে আছে। আর এই ভেবে সে সারা জীবন দুঃখ পাবে।

---